হুমায়ূন আহমেদ

রাক্ষস খোক্কস এবং ভোক্কস

উৎসর্গ

নিষাদের
পাঁচ তলার চাচী
এবং
মোটু চাচুকে
(এই দু'জন মনে করেন নিষাদ
মানব সন্তান না, দেবশিশু।
মনে হয় এদের মাথায় কোনো সমস্যা আছে।)

ভূমিকা

আমার এই বইটি শিশুদের জন্যে লেখা কিন্তু ভূমিকাটা বড়দের জন্যে। অর্থাৎ এই বই যেসব শিশু পড়বে তাদের বাবা-মা'দের জন্যে। বইটির নাম দেখে মনে হতে পারে রূপকথার গল্প। তা কিন্তু না। রূপকথার এক নায়ককে ব্যবহার করে এই সময়ের গল্প বলেছি। আট অধ্যায়ের এই উপন্যাসে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। বাবা-মা'রা কি কষ্ট করে এই প্রশ্নগুলি শিশুদের করে দেখবেন তারা জবাব দিতে পারে কি-না ? শিশুরা কতটা মন দিয়ে বইটা পড়েছে তাই আমার জানার ইচ্ছা। আমি ঈশপ না। গল্পের মাধ্যমে আমি কাউকে কিছু শেখাতে চাই না। শিশুদের শেখানোর দায়িত্ব বাবা-মা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই থাকুক।

হুমায়ূন আহমেদ

নুহাশ পল্লী
১৩ নভেম্বর, ২০০৯

রাক্ষস খোক্কস কী তোমরা নিশ্চয়ই জানো। এদের গল্প শোনার কথা। যারা রাক্ষস খোক্কসের ব্যাপারে কিছু জানো না তারা বাসায় খোঁজ করে দেখ কোনো বাংলা অভিধান পাও কি না। রাজশেখর বসুর চলন্তিকা অভিধানে আছে—

রাক্ষস : নৃশংস এক জাতি।
খোক্কস : রাক্ষস শ্রেণীর।

রাজশেখর বসু পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেননি। খোক্কস রাক্ষসের চেয়ে সাইজে ছোট। সাহসও কম। রাক্ষস মানুষ মেরে খেয়ে ফেলে। খোক্কসও মানুষ মারে, তবে মানুষের মাংস খায় না। তাদের কাছে মানুষের মাংস না-কি লোনা লাগে।

রাক্ষসের প্রাণ থাকে ভোমরার ভেতর। সেই ভোমরাকে রাখা হয় সোনার এক কৌটায়। এই কৌটা থাকে পাতালে। পাতাল থেকে কৌটা উদ্ধার করে ভোমরা মারতে পারলেই রাক্ষসের মৃত্যু হয়। তার আগে না।

খোক্কসের প্রাণ থাকে বোলতার ভেতর। বোলতা থাকে সেগুন কাঠের কৌটায়। সেই কৌটাও পাতালে লুকানো থাকে।

রাক্ষস-খোক্কস দু'জনারই ঘ্রাণশক্তি কুকুরের মতো তীব্র। তবে তারা মানুষ ছাড়া অন্য কিছুর গন্ধ পায় না। মানুষের গন্ধ পেলেই তারা চেঁচিয়ে ওঠে—

হাঁউ মাঁউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ।

তারপর ছুটে যায়। মানুষ মেরে ফেলে। রাক্ষস মরা মানুষ খেয়ে ফেলে। খোক্কস তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

রাক্ষস-খোক্কসের বিষয়ে তো জানলে, এখন কথা হলো ভোক্কসটা কী? আমি নিজেও জানতাম না। এক দুপুরবেলায় হঠাৎ একজন ভোক্কসের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। গল্পটা বলো।

তোমাদের বাসায় ডায়াবেটিস হয়েছে এমন কেউ কি আছে? যদি থেকে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, এরা সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা গম্ভীর ভঙ্গিতে হাঁটে। বৃষ্টি পড়লে ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁটে। হাঁটার সময় ভাব করে যেন বিরাট কিছু করে ফেলেছে। ডায়াবেটিস হলেই হাঁটার এটাই নিয়ম।

আমার ডায়াবেটিস নেই। যদি হয় এই ভয়ে আগেভাগেই হাঁটা ধরেছি। তবে আমি হাঁটি দুপুরে। আমার তো কোনো অফিস নেই যে দুপুরে অফিস করতে হবে। তোমাদের বলে রাখি, লেখকদের কোনো অফিস থাকে না। তারা কাগজ-কলম নিয়ে বসে যেখানে বসেন-সেটাই অফিস।

যারা আমার বই আগেই পড়েছ তারা জানো আমি একজন লেখক। যারা আগে কোনো বই পড়নি এই প্রথম পড়ছ তারা জানলে।

ডিকশনারি খুলে জেনে নাও তো লেখক শব্দের মানে কী? ডিকশনারিতে আছে—

লেখক : যে লেখে।

কাজেই এই পৃথিবীর সবাই লেখক। এমন কাউকে দেখেছ যে লেখে না? এক বছর বয়েসী একটা ছেলের হাতে কলম দিয়ে দাও— সেও লিখবে।

এক দুপুরে ধানমন্ডি লেকের পাশে হাঁটছি, হঠাৎ লক্ষ করলাম এক মধ্যবয়েসী ভদ্রলোক বেঞ্চে একা বসে আছেন। তার হাতে একটা খবরের কাগজ। মাঝে-মাঝেই তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে খপ করে খানিকটা কাগজ মুখে দিয়ে চিবিয়ে গিলে ফেলছেন। গেলার পর গলা খাঁকারি দিচ্ছেন। তাঁর পাশে একটা মিনারেল ওয়াটারের বোতল। কাগজ খেয়ে তিনি এক ঢোক করে পানিও খাচ্ছেন। কিছুক্ষণ হাঁ করে থাকছেন। ঝাল কিছু খেয়ে আমরা যে রকম হাঁ করে থাকি সে রকম।

ভদ্রলোকের গায়ের রঙ শ্যামলা। বেঁটে-খাটো মানুষ। স্বাস্থ্য ভালো। বয়স ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। চোখে চশমা আছে। চশমার ফ্রেমটা দামি। গায়ে হালকা ঘিয়া রঙের হাফশার্ট। পরনের প্যান্টটাও ঘিয়া রঙের। পায়ের জুতা চামড়ার, তবে রঙ শাদা। জুতাজোড়া চকচক করছে।

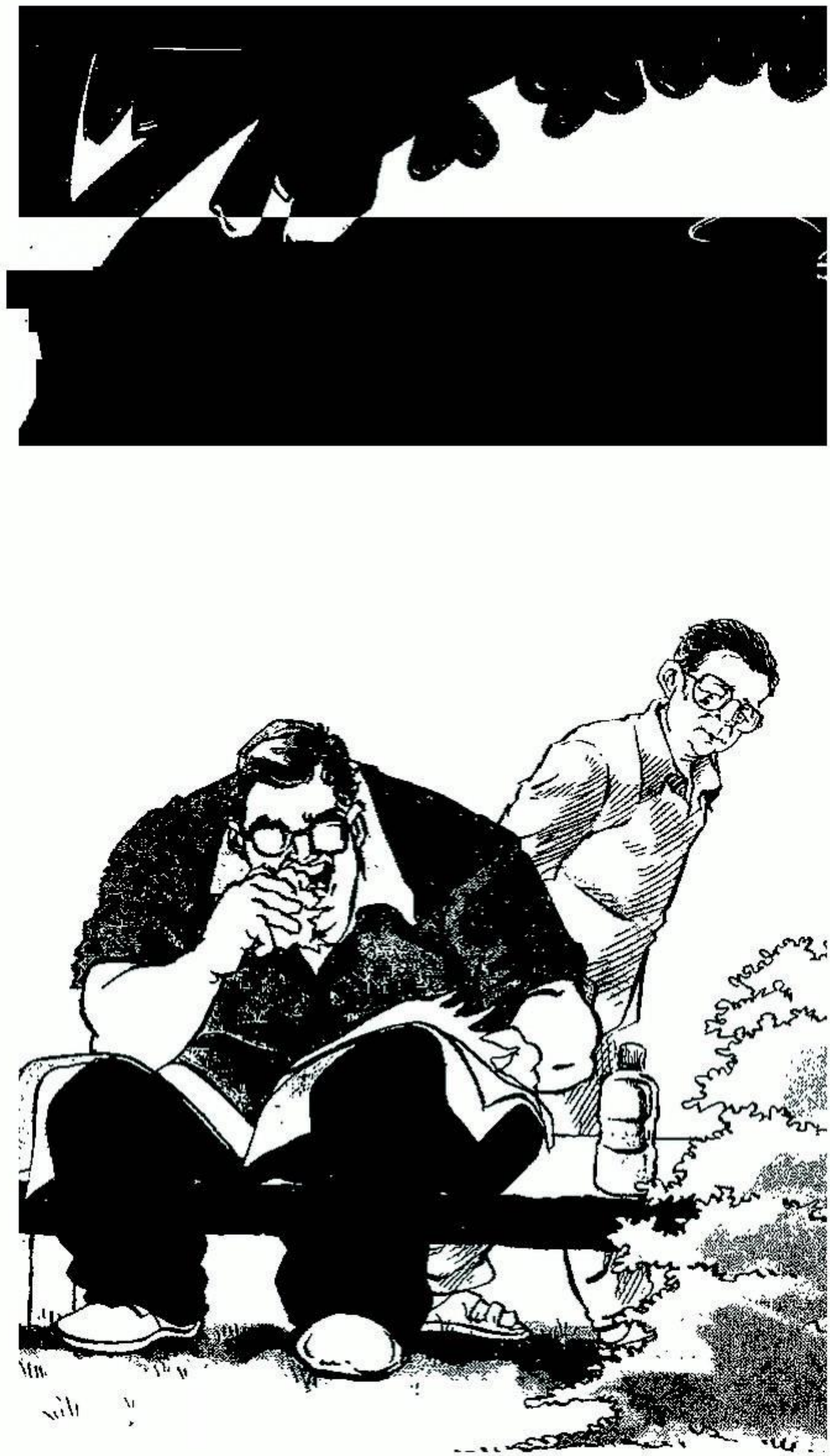

তোমরা হয়তো ভাবছ লোকটার বিষয়ে এত কিছু বলার কী দরকার ? দরকার আছে। লেখকদের চরিত্র বর্ণনা করতে হয়। কারো মুখে যদি কালো তিল থাকে তাও বলতে হয়। লিখতে হয়— 'তাঁর নাকের ডগায় একটা তিল। স্বাস্থ্য ভালো না।' ইত্যাদি।

আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। এবং বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আপনার পাশে বসতে পারি ?

তিনি সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে খানিকটা সরে বসলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, এই বেঞ্চটা আমার সম্পত্তি না। ইচ্ছা করলে বসতে পারেন।

আমি বসতে বসতে বললাম, কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন করা অত্যন্ত অনুচিত। কিন্তু আমি লেখক বলে কৌতূহল একটু বেশি। আমি লক্ষ করলাম, আপনি পত্রিকার পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছেন। সম্ভবত ভুল দেখেছি।

ভদ্রলোক বললেন, ভুল দেখেননি। খেলার পাতার অর্ধেকটা খেয়ে ফেলেছি।

'কারণটা জানতে পারি ?'

'পারেন। একটা নিউজে ভুল ছিল। ফাস্ট বোলার মাশরাফির নামের বানান 'ষ' দিয়ে লিখেছে। এমন রাগ উঠে গেল, পাতাটার অর্ধেক ছিঁড়ে খেয়ে ফেললাম।'

আমি বললাম, এরকম ভুলত্রুটি দেখলে তো গোটা পত্রিকাই খেয়ে ফেলতে হবে।

ভদ্রলোক হতাশ গলায় বললেন, তাই করি। গতকাল তিনটা পত্রিকা খেয়ে ফেলেছি। আজ সকালে একটা পত্রিকা খেয়েছি, আর এখন খেলার পাতার অর্ধেকটা খেলাম।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আপনার পরিচয় জানতে পারি ?

ভদ্রলোক বললেন, আমি সবাইকে পরিচয় দেই না। তবে আপনি লেখক মানুষ, আপনাকে পরিচয় দেয়া যেতে পারে। আমি একজন 'ভোক্কস'।

'ভোক্কসটা কী ?'

'রাক্ষস খোক্কস জাতীয়, তবে আমরা নিরামিষাশী।'

'ও আচ্ছা।'

'ভোক্কস বিষয়ে দয়া করে আর প্রশ্ন করবেন না। প্রশ্ন করলেও জবাব পাবেন না। ভোক্কসরা স্বল্পভাষী।'

আমি বললাম, এই বিষয়ে আর প্রশ্ন করব না। আমি কি আপনাকে এককাপ চা খাওয়াতে পারি ? চাওয়ালা ডাকব ?

ভোক্কস জবাব দিলেন না। আমি চাওয়ালাকে ডাকলাম। তিনি নিঃশব্দে চা খেলেন। সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলাম। তিনি একটা সিগারেট নিতে নিতে বললেন, যাবার সময় প্যাকেটটা রেখে যাবেন।

আমি বললাম, অবশ্যই।

'দেয়াশলাইও রেখে যাবেন।'

আমি বললাম, এই নিন সিগারেটের প্যাকেট এবং দেয়াশলাই। কিছুক্ষণ বসি আপনার পাশে ?

তিনি জবাব দিলেন না। আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিট বসে রইলাম। তিনি একটি কথাও বললেন না। তার দৃষ্টি ধানমন্ডি লেকের পানিতে স্থির হয়ে রইল। আমি আরো কিছুক্ষণ থাকতাম, কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষিদে লেগেছে। আমি খানিকটা তোমাদের মতো, ক্ষুধা সহ্য করতে পারি না।

তোমরা কি ভাবছ, ভোক্কস দেখে খুবই উত্তেজিত অবস্থায় আমি ঘরে ফিরলাম ? তা কিন্তু না। আমাদের আশেপাশে বিচিত্র সব মানুষ বাস করে। অনেকেই মানসিকভাবে অসুস্থ। অনেকে ভান করে তারা অসুস্থ। অসুস্থ ভান করার কিছু সুবিধাও আছে। ওরা সেই সুবিধা নিতে চায়। আবার কেউ কেউ স্রেফ মজা করার জন্যে বিচিত্র কাণ্ডকারখানা করে। অনেক পাগল ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়ায়, তারা সবাই কিন্তু পাগল না। এদের মধ্যে অনেকেই আছে ভং-এর পাগল। কাজেই ভোক্কস নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামালাম না। তবে আমার খাতায় তার নাম তুললাম। বিচিত্র কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হলে আমি তার নাম এবং কেন সে বিচিত্র তা লিখে রাখি। তোমাদের মতো ছোটদের নামও আছে। রনি নামের আট বছরের একটি মেয়ের নাম আছে। সে যে-কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে দেখা হলেই পরিচিত ভঙ্গিতে কাছে যায় এবং আদুরে গলায় বলে, 'ছোট মামা, কেমন আছ ?' তার কাছে পৃথিবীর সব পুরুষই ছোট মামা। কেউ মেজো মামা, বড় মামা না। চাচা, খালু না। সবাই ছোট মামা।

এরপর কয়েক দিন কাটল, দুপুর-ভ্রমণে বের হলাম না। বৃষ্টির কারণে ভ্রমণ বন্ধ। রোজই বৃষ্টি। একদিন দেখি বৃষ্টি নেই। আকাশ ঘন নীল। ঝকঝকে রোদ উঠেছে। আমি আয়োজন করেই বের হয়েছি। আগের সেই বেঞ্চটায় ভোক্কস বসে আছে। তার হাতে খবরের কাগজ নেই। আগের

দিনের মতই তার পাশে মিনারেল ওয়াটারের একটা বোতল। সে চুকচুক করে পানি খাচ্ছে। (একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ যে লোকটাকে আমি এখন তুমি তুমি করে বলছি। তিনি চুকচুক করে পানি খাচ্ছেন না লিখে লিখেছি— 'সে চুকচুক করে পানি খাচ্ছে।' কারণটা হচ্ছে সে তার ভোক্কস পরিচয় দিয়ে নিজেকে খানিকটা ছোট করে ফেলেছে। এখন আর আপনি আপনি করতে হবে না। তবে তার সঙ্গে কথা বলার সময় ভদ্রতা করে আপনি বলতেই হবে। সে ভদ্র পোশাক পরে আছে। ফকির মিসকিন টাইপ কেউ না যে চট করে তুমি বলা যায়।) আমি এগিয়ে গেলাম। পাশে দাঁড়িয়ে পরিচিতজনের ভঙ্গিতে বললাম, ভালো আছেন ?

ভোক্কস আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, হুঁ।

'আমাকে চিনতে পারছেন ?'

'হুঁ।'

'আজ দেখছি আপনার হাতে খবরের কাগজ নেই। খেয়ে ফেলেছেন ?'

'হুঁ।'

'বসি আপনার কাছে ? কিছুক্ষণ গল্পগুজব করি ?'

ভোক্কস একটু সরে বসল। আমাকে বসার জন্যে ইশারা করল। আমি বসলাম।

'আপনি কি শুধু খবরের কাগজ খান, না-কি গল্প-উপন্যাসের বইও খান ? আমি একজন লেখক, আমার কোনো বই কি খেয়েছেন ?'

ভোক্কস বলল, আপনার লেখা খারাপ হলে অবশ্যই খেয়েছি। যেসব লেখা আমার পছন্দ হয় না সেগুলি খেয়ে ফেলি। গত রাতে ৪৮ পাতার একটা বই খেয়েছি।

'কী বই ?'

'কবিতার বই। নাম 'হিক্কা উঠেছে দুপুরে'।'

'মনে হচ্ছে আধুনিক কবিতার বই।'

ভোক্কস বিরক্ত হয়ে বলল, তা জানি না। বইটার যে-কোনো কবিতা পড়লেই মেজাজ খারাপ হয়।

আমি বললাম, আপনার পেশা কী জানতে পারি ?

'জানতে পারেন। আমি বাংলাবাজারের প্রুফ রিডার। নিজেও একজন লেখক।'

'বলেন কী ?'

'গোটা বিশেক বই লিখেছি। সবই ইতিহাসের বই। 'রাক্ষস-খোক্কসের বিবর্তন', 'রাক্ষস সমাজের পতন', 'রাক্ষস-ভোক্কস যুদ্ধ'— এইসব।'

'কোনো বই কি প্রকাশিত হয়েছে ?'

'না।'

'প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলেন ?'

ভোক্কস বলল, আমি যে প্রকাশনার বইয়ের প্রুফ দেখি তার মালিক সোবাহান সাহেবকে তিনটি পাণ্ডুলিপি পড়তে দিয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন। ইতিহাসের এইসব বই তিনি ছাপেননি, তবে আমার দু'টা অন্য বই ছেপেছেন। একটা হলো 'ছোটদের বানান শিক্ষা'। আরেকটা 'ছোটদের সহজ ব্যাকরণের বই'। কোনোটাই তেমন বিক্রি হয় না।

আমি বললাম, আমার সঙ্গে অনেক প্রকাশকের যোগাযোগ আছে। একটা পাণ্ডুলিপি আমাকে দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

ভোক্কস জবাব না দিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। শার্টের পকেট থেকে সানগ্লাস নিয়ে চোখে পরল। আমি বললাম, সিগারেট খাবেন ? সিগারেট দেব ?

সে এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। সম্ভবত সে এখন আর আমার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছে না। আমি উঠে চলে গেলাম। ভোক্কসের খবর বের করা এখন আমার জন্যে সহজ হয়ে গেল। বাংলাবাজারের প্রকাশক সোবাহান সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, তবে তাঁর টেলিফোন নাম্বার সহজেই পাওয়া যাবে।

সোবাহান সাহেবের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হলো সন্ধ্যাবেলায়। আমি বললাম, আপনার এক প্রুফ রিডারের সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় হয়েছে। সে নিজের পরিচয় দিচ্ছে ভোক্কস হিসেবে।

সোবাহান সাহেব বললেন, ঐ গাধাটার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ হলো ? বিশাল গাধা। তবে ভালো প্রুফ রিডার।

'তাই নাকি ?'

'অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, রাজশেখর বসুর চলন্তিকা ডিকশনারি তার মুখস্থ।'

'বলেন কী ?'

'অতি নির্বিরোধি মানুষ। কারো সঙ্গে কোনো আলোচনায় নেই, বাহাসে নেই। নিজের মনে কাজ করে। সব সময় ফিটফাট বাবু।'

'সে যে পত্রিকা খেয়ে ফেলে এটা জানেন ?'

'জানি। আমাদের এখানে ছাপার জন্যে দেয়া অনেক লেখকের পাণ্ডুলিপি সে খেয়ে ফেলেছে। এই নিয়ে প্রায়ই দিগদারি হয়। আমি যখন বলি— ভাই আপনার পাণ্ডুলিপি আমার একজন প্রুফ রিডার খেয়ে ফেলেছে। দয়া করে আরেকটা পাণ্ডুলিপি দিন। তখন তারা বিশ্বাস করেন না।'

'বিশ্বাস না করারই কথা।'

'অনেকবার তার চাকরি নট করেছি। চাকরি নট করার পরেও সে প্রতিদিন আসে। অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা লোক দাঁড়ানো। দেখে মন খারাপ হয়। তখন ডেকে চাকরি দেই।'

'সে বলছিল, তার লেখা কিছু বইয়ের পাণ্ডুলিপি আপনার কাছে আছে। একটা পাণ্ডুলিপি কি পাঠাতে পারবেন ?'

সোবাহান সাহেব বললেন, আমার ধারণা ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছি। কারণ, ডাস্টবিনে ফেলারই জিনিস। তারপরেও খুঁজে দেখব। আপনাকে আগামীকালই জানাব।

পরদিন সোবাহান সাহেব জানালেন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। তিনি ডাস্টবিনেই ফেলেছেন। আমি বললাম, ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই। এটা এমন জরুরি কিছু না।

সোবাহান সাহেব বললেন, আপনার খুব পড়ার আগ্রহ থাকলে গাধাটাকে বলি, সে আবার লিখে দেবে।

আমি বললাম, দরকার নেই।

কোনো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন লেগে থাকার ধৈর্য আমার নেই। 'ভোক্কস' অতি তুচ্ছ বিষয়। তারপরেও এক দুপুরে বাংলা ডিকশনারি হাতে নিয়ে বের হলাম। ভোক্কস বাবাজি ডিকশনারি মুখস্থ করে ফেলেছে, ব্যাপারটা কতদূর সত্য জানা দরকার। যদি দেখা যায় সত্যি, তাহলে তার বিষয়ে কিছুটা আগ্রহী হওয়া যেতে পারে।

ভদ্রলোককে আগের জায়গাতেই পাওয়া গেল। এবার তার চোখে সানগ্লাস। চোখে সানগ্লাস দিয়ে তিনি খাঁ খাঁ রোদে বসে আছেন, অথচ কাছেই প্রকাণ্ড এক জারুল গাছ। জারুল গাছের নিচেও একটা বেঞ্চ আছে। বেঞ্চটা খালি। বেঞ্চের উপর সুন্দর ছায়া।

আমি তার পাশে বসতে বসতে বললাম, কেমন আছেন ?

সে জবাব না দিয়ে হাই তুলল। আমি বললাম, শুনতে পেয়েছি আপনি পুরো ডিকশনারি মুখস্থ করে বসে আছেন। কথাটা কি সত্যি ?

'হুঁ।' (ভোক্কস কিন্তু জানতে চাইল না আমি কার কাছ থেকে শুনেছি। সেটাই স্বাভাবিক ছিল।)

আমি বললাম, আমার সঙ্গে একটা বাংলা ডিকশনারি আছে। আপনার মুখস্থ শক্তি পরীক্ষা করে দেখতে পারি ?

'হুঁ।'

আমি ডিকশনারির পাতা উল্টাচ্ছি। কঠিন কোনো শব্দ বের করা যায় কি না। তেমন পাচ্ছি না। একটা পাওয়া গেল। আমি বললাম, রেউড়ি কী ?

'এক প্রকার মিষ্টান্ন।'

'হয়েছে। এখন বলুন 'রুমালী' কী ?'

'ঠগ জলদস্যু।'

আমি নিজেই চমকালাম। রুমালী যে ঠগ জলদস্যু তা জানতাম না। আমার ধারণা ছিল রুমালী এসেছে রুমাল থেকে।

'আচ্ছা বলুন, 'হাঁড়ল' কী ?'

'বড় গর্ত।'

'হয়েছে। এখন বলুন, 'শকরকন্দ' কী ?'

'মিষ্টি আলু।'

আমি ডিকশনারি বন্ধ করতে করতে বললাম, আপনি পাশ। একশ'তে আপনাকে দিচ্ছি একশ' দশ। বাংলা ডিকশনারি অবশ্যই আপনার মুখস্থ।

ভোক্কস হাই তুলতে তুলতে বলল, ইংরেজি অভিধানও মুখস্থ। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান।

'বলেন কী ? ডিকশনারি কেন মুখস্থ করেছেন ?'

'কাজকর্ম নাই, অবসর কাটে না, এইজন্যে মুখস্থ করেছি। এখন ভালো ভালো গল্প-উপন্যাস মুখস্থ করছি।'

'কোনোটা কি মুখস্থ আছে ?'

'দেবদাস মুখস্থ করেছি। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী মুখস্থ করেছি। তিন নং চ্যাপ্টারটা বাদ দিয়ে। ঐ চ্যাপ্টারটা পছন্দ হয়নি।'

আমি বললাম, আপনি আমার সাথে চারটা ডাল-ভাত খাবেন ? খেলে খুবই খুশি হব।

ভোক্কস অন্যদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল। কী বলছে শোনার জন্যে আমি কান পাতলাম। কী আশ্চর্য! সে শুরু থেকে ডিকশনারি মুখস্থ বলে যাচ্ছে—

অ, অন্—অভাব, বৈপরীত্য, অন্যতা, অপ্রশস্ত, অল্পতা, ই: সূচক অব্যয়।
অঋণি— ঋণশূন্য, ঋণমুক্ত।
অংশ— ভাগ, খণ্ড (জমিদারির—। নারায়ণের—)। Share. দেবতার ঔরস, দেবতা হইতে লব্ধ সহজাত প্রভাব। বৃত্ত পরিধির ১/৩৬০ ভাগ, Degree.

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। এই লোক বদ্ধ উন্মাদ। তার পেছনে সময় নষ্ট করার মানে হয় না।

ভোক্কস বলল, চলে যাচ্ছেন না-কি ?

আমি বললাম, হুঁ। কিছু কাজ আছে।

'একটু বসুন ।'

আমি বসলাম। ভোক্কস বলল, আমার বয়স কত বলতে পারবেন ?

'না।'

'অনুমান করুন তো।'

'৪০ থেকে ৫০ এর ভেতরে।'

'হল না। আমার বয়স ছয় হাজারের সামান্য বেশি।'

আমি বললাম, আপনি ছয় হাজার বয়স পর্যন্ত বেঁচে আছেন ?

'হ্যাঁ। বেঁচে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন মরতে ইচ্ছে করে কিন্তু মরা সম্ভব না। কারণ আমার প্রাণ ভোমরার মধ্যে। সেই ভোমরা কোথায় আছে তাও জানি না। যদি জানতাম নিজেই ভোমরা টিপে মেরে ফেলতাম।'

আমি খানিকটা সরে বসলাম। কঠিন পাগলদের খুব কাছাকাছি আসতে নেই।

এই অধ্যায় থেকে কী কী শিখলে তার পরীক্ষা

১. রাক্ষস কি ?
২. ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে রাখার নিয়ম কি ?
৩. বাংলা ডিকশনারি 'চলন্তিকা'র লেখকের নাম কি ?
৪. রুমালী শব্দের মানে বলো।
৫. পথের পাঁচালী কার লেখা ?
৬. পরিধির ৩৬০ ভাগের এক ভাগকে কী বলে ?

শরৎকাল। আমি আমার বসার ঘরে। ড্রাইভারকে পাঠিয়েছি পেট্রলপাম্পে। গাড়িতে তেল ভরে ফিরলেই রওনা হব। যাব আশুলিয়ায়। সেখানে না-কি প্রচুর কাশফুল ফুটেছে। কাশফুল দর্শন উৎসব। আরো কঠিনভাবে বললে, ঋতু পালন উৎসব।

বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। প্রতিটি ঋতু পালনে আমার কিছু নিয়ম আছে। যেমন, শরৎকালে কাশফুল দেখতে যাই। বর্ষায় বৃষ্টিতে ভেজার জন্যে নুহাশ পল্লীতে যাই। শীতে গ্রামে যাই। মটরশুঁটি ক্ষেতের পাশে বসে আগুনে পুড়িয়ে মটরশুঁটি খাই।

ড্রাইভার তেল নিয়ে এসেছে। গাড়িতে উঠতে যাব তখন বাধা পড়ল। এক ভদ্রলোক এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে, খুব না-কি জরুরি। ভদ্রলোক বলছেন, তিনি আমার পরিচিত। বিরক্ত মুখে ভদ্রলোককে আসতে বললাম। (তোমরা কি লক্ষ করেছ জরুরি কাজের সময় বাধা পড়বেই। যেদিন তোমার বন্ধুর জন্মদিন সেদিনই তোমাদের ড্রাইভার ডিউটি করতে আসবে না। বেছে বেছে তোমার ছোট খালার বিয়ের দিন তোমার জ্বর উঠবে ১০৩ ডিগ্রি। এই ধরনের ঘটনার একটা সূত্র আছে। সূত্রটাকে বলে মার্ফির সূত্র। ইংরেজিতে Murphy's law.)

মুখভর্তি দাড়ি এবং মাথায় টুপি পরা সুফি সুফি চেহারার এক ভদ্রলোক এলেন। তাঁর চোখে সুরমা। পাঞ্জাবি নেমে এসেছে পায়ের পাতার কাছাকাছি। ডান হাতে তসবি, ক্রমাগত তসবি টেনে যাচ্ছেন। তিনি ঘরে ঢোকামাত্র আতরের গন্ধে ঘর ভরে গেল। আমি তাঁকে চিনতে পারলাম না। আগে কখনো দেখেছি বলেও মনে হলো না। ভদ্রলোক বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আমার নাম সোবাহান।

আমি তারপরেও চিনলাম না। ভদ্রলোক বললেন, আপনার সঙ্গে আমার টেলিফোনে আলাপ হয়েছে। আমার একজন প্রুফ রিডারকে আপনি চিনেন। তার নাম হামিদুর রহমান। যদিও সবাইকে সে বলে, তার নাম ভোক্কস।

এখন ভদ্রলোককে চিনলাম। তিনি বললেন, খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। একটু যদি সাহায্য করেন।

আমি বললাম, বিপদটা কী ?

তিনি বললেন, গতকাল দুপুরে ভোক্কসকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। এখন থানা-হাজতে আছে। আজ ছুটির দিন বলে কোর্টে তোলেনি। আগামীকাল তুলবে।

'সে করেছে কী ?'

'একজন পুলিশ সার্জেন্টের নোট বই হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পাতা ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে।'

আমি বললাম, এই বিষয়ে আমি কী করতে পারি ?

সোবাহান সাহেব কাতর গলায় বললেন, আপনার অনেক জানাশোনা। আপনি থানায় একটা টেলিফোন করলেই ওসি সাহেব তাকে ছেড়ে দেবেন। ভোক্কসের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। সে একা থাকে। আমি তাকে অত্যন্ত স্নেহ করি। ভোক্কসের জন্যে চিন্তায় অস্থির হয়ে কাল রাতে একফোঁটা ঘুম হয় নাই। এখন আপনি যদি থানায় একটা টেলিফোন করেন, আপনার কাছে চিরঋণী থাকব।

আমি পড়লাম মহাবিপদে। আমাদের সত্যি কথাটা বলি— লেখকদের টেলিফোনকে কেউ কখনো গুরুত্ব দেয় না। তারা সমাজের ক্ষমতাবানদের কেউ না। টেলিফোন কেন আমি নিজে থানায় উপস্থিত হয়ে দেন-দরবার করলেও কিছু হবে না। ওসি সাহেব হয়তো এককাপ চা খেতে বলে ভদ্রতা করবেন। বলবেন, নানান কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি বলে আপনার কোনো বই পড়ি নাই। কিছু মনে করবেন না। এখন কি লিখছেন ? আমার ছোট মেয়েকে একটা অটোগ্রাফ দিন তো। সে কেজি ওয়ানে পড়ে। আপনার নাটক দেখেছে।

ভোক্কসের জন্যে খারাপ লাগছে, কিন্তু কী করব তোমরাই বলো। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী কাউকে আমি চিনি না। তাঁদের কারো সঙ্গে পরিচয় থাকলে চেষ্টা করা যেত। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা আসামি খালাস করতে খুব পছন্দ করেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন যাদের খালাস করে আনা হবে, তারা বাকি জীবন অনুগত থাকবে। তাদের হয়ে কাজ করবে। যদিও বাস্তবে তা হয় না।

আমি সোবাহান সাহেবকে বললাম, ভাই আপনি যান। আমি দেখি কিছু করতে পারি কি না।

==========

সোবাহান সাহেব চলে গেলেন। যাবার আগে কয়েকবার বললেন, 'শুকরিয়া। আপনার অনেক মেহেরবানি।'

আমি মন খারাপ করে বারান্দায় বসে রইলাম। তখন নিষাদের হাত ধরে শাওন (আমার স্ত্রী, গান জানে) এসে বলল, কই আমরা কাশফুল দেখতে যাচ্ছি না ?

আমি বললাম, না।

'না কেন ?'

আমি ভোক্কসের ব্যাপারটা বললাম। শাওন বলল, সে অপরাধ করে ধরা পড়েছে। তাকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে তুমি ব্যস্ত কেন ? তুমি কি মন্ত্রী ?

আমি বললাম, ভোক্কস বোকাটাইপের একজন মানুষ। কোনো অপরাধ করার ক্ষমতাই তার নেই।

শাওন বলল, আমি ব্যবস্থা করছি। তুমি চলো তো কাশফুল দেখে আসি।

আমি বললাম, কী ব্যবস্থা করবে ?

সে বলল, করব একটা কিছু।

আমি কিছুটা শান্ত হলাম। কারণ শাওনের সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোকজনের জানাশোনা। তার মা আবার সরকারি দলের এমপি। এমপিদের কাজ কি তোমরা জানো ? প্রধান কাজ আইন পাস করা। তবে বেশির ভাগ সময় তারা চেষ্টা করেন অপ্রধান কাজ করতে। যেমন বড় বড় হাই তুলে ঘুমাতে। যখন ঘুম আসে না তখন টেবিল চাপড়িয়ে বলেন, 'শেম শেম।' 'শেম' একটা ইংরেজি শব্দ, যার অর্থ 'লজ্জা'। বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের অনেক মমতা আছে। তাঁদেরও নিশ্চয়ই আছে। তবু তাঁরা সংসদে লজ্জা লজ্জা বলে টেবিল না চাপড়িয়ে কেন শেম শেম বলে টেবিল চাপড়ান কে জানে। হয়তো 'শেম' শব্দটায় 'লজ্জা' অনেক বেশি। আমাদের এমপিরা আরেকটা কাজ খুব আনন্দের সঙ্গে করেন...। থাক আর বললাম না। শেষে আমাকেও ভোক্কসের মতো জেলে ঢুকিয়ে দেবে।

আমি মোটামুটি নিশ্চিন্তে কাশফুল দেখতে গেলাম। শাওন নিশ্চয়ই তার মা'কে দিয়ে কোনো ব্যবস্থা করাবে।

কাশফুল দেখে মুগ্ধ হলাম। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। মনে হচ্ছে চাঁদের আলো জমাট বেঁধে বাতাসে দুলছে। নিষাদ মহানন্দে কাশবনের ভেতর লুকোচুরি খেলতে লাগল। তার আনন্দ দেখে আমি অভিভূত।

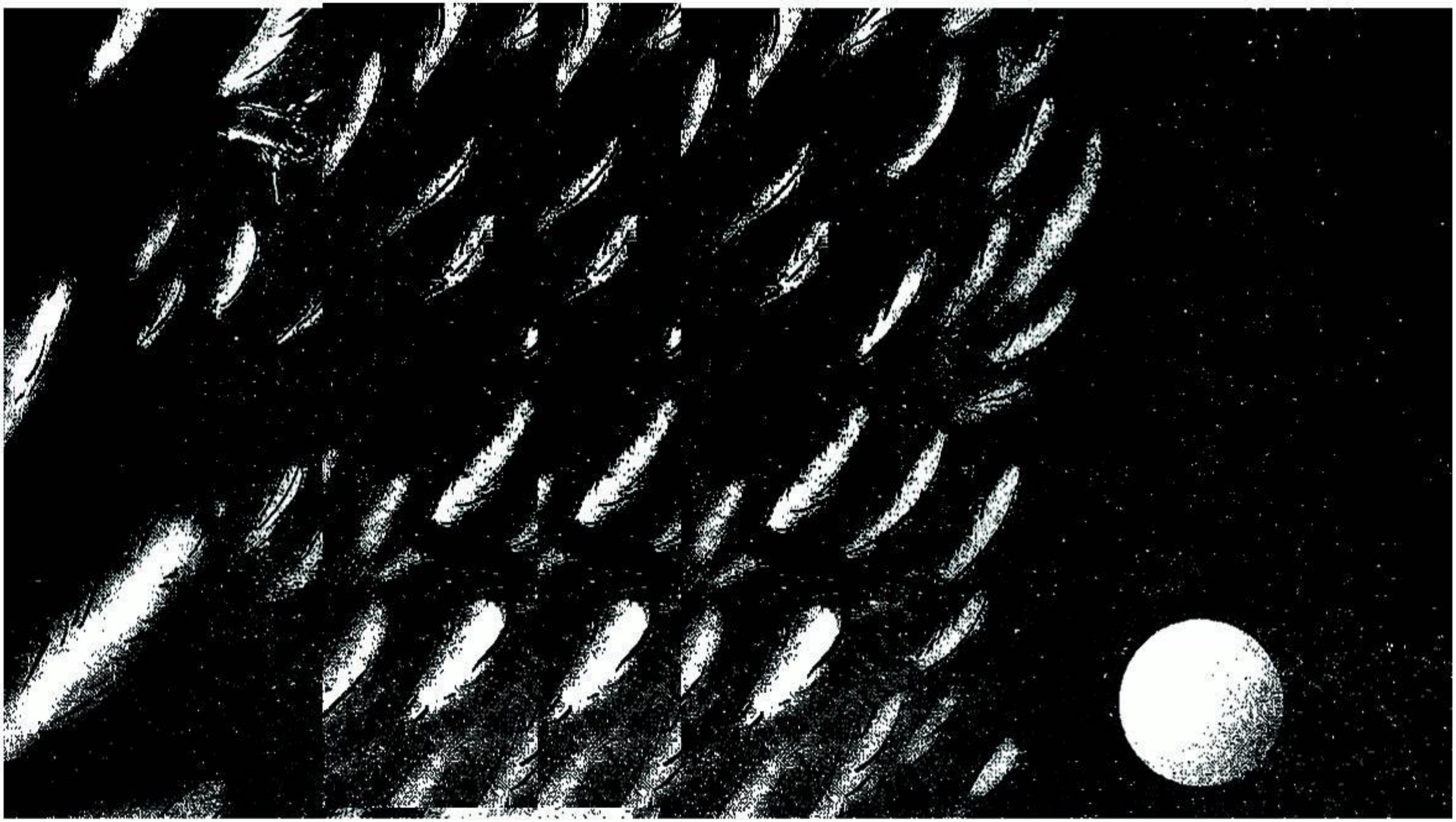

==========

আমাদের পরিকল্পনা ছিল ঘণ্টাখানিক থেকে চলে আসব। পুত্রের উল্লাস-নৃত্য দেখে বিকেল পর্যন্ত থাকলাম। বাসায় ফিরলাম সন্ধ্যায়। অবাক হয়ে দেখি, গেটের বাইরে ভোক্কস দাঁড়িয়ে আছে। গেটের দারোয়ান বলল, ধানমন্ডি থানার ওসি সাহেব তাকে এখানে নামিয়ে রেখে গেছেন। বলে গেছেন, এই লোক যেন আপনার সঙ্গে দেখা না করে কোথাও না যায়। ওসি সাহেব একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন এই নাম্বারে যেন যোগাযোগ করা হয়। নাম্বারটা ওসি সাহেবের।

আমি টেলিফোন করলাম। ওসি সাহেব অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, স্যার, লোকটাকে আমরা কোর্টে তুলতাম না। এমনিতেই ছেড়ে দিতাম। পাগল মানুষ। এদের জেলে ঢোকানোর কিছু নেই। আপনি তার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছি।

'ভাই থ্যাংক য়্যু। সে করেছে কী?'

'এক পুলিশ সার্জেন্ট গাড়ির ড্রাইভারকে জরিমানা করছিল। ড্রাইভার ট্রাফিক সিগন্যাল অগ্রাহ্য করে গাড়ি চালাচ্ছিল। এইজন্যে পাঁচশ' টাকা জরিমানা। তখন কোত্থেকে এই পাগল ছুটে এসে জরিমানার কাগজটা চিবিয়ে গিলে ফেলেছে। এই পাগলকে চেনেন কীভাবে?'

'আরেকদিন বলব। ভাই আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।'

ভোক্কস আমার বসার ঘরের সোফায় গম্ভীর হয়ে বসে আছে। চোখে সানগ্লাস আগে ছিল না। এখন তার চোখে সানগ্লাস। তাকে খেতে দেয়া হয়েছে চা এবং চানাচুর। আমরা সবাই গুরুত্বহীন মানুষকে চা এবং বাসি চানাচুর খেতে দেই। চানাচুর অনেকদিন আগে কেনা থাকে। কৌটায় ভর্তি করে রাখা হয় বলে বাসি হয়ে যায়। তাদের জন্যে বুয়ারা চা বানায় হেলাফেলা করে। সেই চা হয় ঠাণ্ডা, সর ভাসা এবং অতিরিক্ত মিষ্টি। গুরুত্বহীন লোকরা এই চা আগ্রহ করে খায়। পিরিচের চানাচুরও পুরোটা শেষ করে।

তোমরা খেয়াল করলে এই ব্যাপারটা তোমাদের বাসাতেও দেখবে। গুরুত্বহীন মানুষ এবং গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আলাদা করে ফেলতে পারবে। তোমাদের বাসায় যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো মানুষ আসেন, তাহলে তাদের জন্যে ট্রলিতে করে খাবার আসবে। তোমার মা নিজে টি-পট থেকে চা ঢেলে দেবেন। গুরুত্বপূর্ণ মানুষের আরেকটি লক্ষণ হলো তারা কোনো খাবারই খাবেন না। তবে চায়ের কাপে আলতো করে কয়েকটা চুমুক দেবেন।

আগেই বলেছি ভোক্কস চা চানাচুর কিছুই খাচ্ছে না। আমি বললাম, আপনার উপর অনেক ধকল গিয়েছে। থানা-পুলিশ-হাজত। রাতে মনে হয় ঘুমও হয়নি। আপনি বাসায় চলে যান। ভালো একটা শাওয়ার নিয়ে ঘুম দেন।

ভোক্কস বলল, আচ্ছা!

কিন্তু সে বসেই রইল। যেন সে মানুষ না। পাথরের কোনো মূর্তি। আমি নিজে হট শাওয়ার নেবার জন্যে বাথরুমে ঢুকলাম। আমার নিয়ম হচ্ছে ঘণ্টাখানিকের জন্যে বাইরে গেলেও হট শাওয়ার নেই। মানুষের যে কোনো কর্মকাণ্ডের পেছনে কারণ থাকে (ব্যাপারটা মনে রেখো কিন্তু)। আমার কারণটা বলি। আমি পড়াশোনার একটা অংশ করেছি দেশের বাইরে, আমেরিকায়। তখন ল্যাবরেটরিতে আমাকে পারদ নিয়ে কাজ করতে হতো। পারদ অতি বিষাক্ত ধাতুর একটি। পারদ শরীরে ঢুকে গেলে বের হয় না। শরীরে জমা হতে থাকে। একটা পর্যায়ের পরে হয় মারকারি পয়েজনিং অর্থাৎ পারদ বিষাক্ততা। তখন নানান সমস্যা দেখা দেয়। একটা সমস্যা হলো হেলুসিনেশন। অর্থাৎ এমনসব জিনিস দেখা যা বাস্তবে নেই। কিছুদিনের জন্যে আমার হেলুসিনেশন হয়েও ছিল। আমি দেখতাম আমার প্রতিটি আঙুলের ডগা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। অদ্ভুত দৃশ্য। এরপর আমি ল্যাবরেটরি থেকে ফিরেই এক ঘণ্টা সময় নিয়ে হট শাওয়ার নিই। আগুন গরম পানিতে স্নান করি।

এখন মূল গল্পে ফিরে আসি। বাথরুম থেকে বের হয়ে বসার ঘরে এসে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। নিষাদ ভোক্কসের পাশে বসে আছে। সে চানাচুরের প্লেট থেকে বাদাম বের করে করে ভোক্কসকে খাইয়ে দিচ্ছে। আগ্রহের সঙ্গে প্রতিবারই জিজ্ঞেস করছে, ভোক্কস মামা। মজা আছে?

ভোক্কস বলছে, হুঁ।

'এখন পানি খাবে?'

'হুঁ।'

নিষাদ পানির গ্লাস তুলে ভোক্কসের মুখের কাছে ধরল। ভোক্কস কিছু পানি খেল। বাকিটা নিষাদ তার গায়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'সরি। তুমি ভিজে গেছ।'

---

* তোমাদের বাসায় নিশ্চয়ই থার্মোমিটার আছে। আমি দেখেছি থার্মোমিটার ভেঙে গেলে তার পারদ হাতে নিয়ে অনেক বাচ্চা খেলা করে। এই কাজটা কখনো করবে না। খবরদার।

নিষাদের বয়স দুই বছর সাত মাস। সে এর মধ্যে সমস্ত কথা শিখে গেছে। নানান দুষ্টামি শিখেছে। কোনো ছড়া তাকে শেখানো হলে সে ছড়ার শব্দ বদলে এমন সব শব্দ ঢুকাচ্ছে যা শুনে আশেপাশের সবাই মজা পায় কিন্তু তার মা রাগ করে। একটা নমুনা দেই। তার প্রিয় ছড়া হলো—

"আমি হব সকালবেলার ঘুঘু
সবার আগে কুসুম বাগে
করব আমি 'হাগু'।"

আড়াই বছর বয়েসী কোনো শিশুর পক্ষে মিল দিয়ে ছড়া বানানো সম্ভব না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রথম ছড়া বানিয়েছিলেন সাত বছর বয়সে। ঐ ছড়াটা কি তোমরা জানো ? আচ্ছা বলছি শোনো—

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলি দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস হুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

যে কথা বলছিলাম, ঘুঘুর সঙ্গে হাগুর মিল দিয়ে কবিতাটি নিষাদকে আমার কোনো বন্ধুবান্ধব শিখিয়েছে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

নিষাদ ছড়া বলা ছাড়াও আরেকটি অত্যন্ত বিরক্তিকর কাজ করে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিচিত্র সব জায়গায় লুকিয়ে রাখে। যখন জিনিসটা খুঁজে না পেয়ে সবাই হতাশ এবং বিরক্ত তখন সে মিটিমিটি হাসতে হাসতে বের করে দেয়। আমার ঘড়ি একবার বের হলো জুতার ভেতর থেকে। শাওনের চুড়ি পাওয়া গেল ডাস্টবিনে। একবার আমার ড্রাইভার পিন্টুর মোবাইল পাওয়া গেল কমোডে। তাকে নতুন মোবাইল কিনে দিতে হলো।

নিষাদের সঙ্গে ভোক্কসের বাড়াবাড়ি খাতির দেখে আমি অবাক হলাম না। সে অতিদ্রুত কাউকে কাউকে পছন্দ করে আবার অতিদ্রুতই অনেককে অপছন্দ করে। আমার কলেজ জীবনের প্রিয় একজন বন্ধুর নাম আবু করিম। সে বিখ্যাত একজন আর্কিটেক্ট। নিষাদকে সে অত্যন্ত পছন্দ করে। প্রায়ই নানান ধরনের গিফট নিয়ে আসে। নিষাদ প্রতিটি উপহার আগ্রহের সঙ্গে নিয়ে কঠিন গলায় বলে, তোমাকে আমি থাপ্পড় দিব। করিম বেচারা বিব্রত হয়। আমি বিব্রত হই। শাওন বিব্রত হয়ে বলে, বাবা উনি তোমার চাচা হন। সরি বলো।

নিষাদ বলে, সরি।

তারপরই গলা নামিয়ে বলে, আমি চাচাকে থাপ্পড় দিব।

বাচ্চাদের সাইকোলজি (মানসিকতা) বোঝা বা বোঝার চেষ্টা অর্থহীন। তারা তাদের যে জগতে বাস করে সেই জগতের সন্ধান আমরা বড়রা জানি না।

নিষাদ ভোক্কসের গলা জড়িয়ে ধরে আছে। ভোক্কস তাকে দোল দিতে দিতে গানের মতো সুরে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। আমি কান পেতে শুনলাম— অর্থহীন কিছু শব্দ।

"এশকান বেশকান কামনিম
মেশকান ঝেমকান লামসিম।"

একসময় দুলুনি খেলা শেষ হলো। নিষাদ বলল, ভোক্কস মামা। তুমি আমার জন্যে বেলুন আনবে, চুইংগাম আনবে আর ফ্রুটিকা আনবে।

ভোক্কস বলল, আচ্ছা।

আমি বললাম, ভাই আজ চলে যান। রেস্ট করুন।

ভোক্কস উঠে দাঁড়াল। নিষাদ তার হাত ধরে ঝুলতে লাগল। কিছুতেই যেতে দেবে না। শাওন এসে জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেল। সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। অতি বিরক্তিকর অবস্থা।

রাত বারোটা দশ বাজে। নিষাদ হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। আমি শাওনকে নিয়ে ছবি দেখছি। কার্টুন ছবি। নাম 'UP'। একজন বুড়োকে নিয়ে গল্প। আমরাও কিন্তু তোমাদের মতো কার্টুন ছবি দেখতে পছন্দ করি। ছবির খুব মজার একটা জায়গায়, গেট থেকে দারোয়ান টেলিফোন করে জানাল, ভোক্কস নামের একজন এসেছে। হাতে বেলুন। সে ঢুকতে চাচ্ছে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, এত রাতে কাউকে বাড়িতে ঢুকানো যাবে না। সে যে বেলুন এনেছে, ওগুলো রেখে বিদায় করে দাও।

শাওন বলল, কে এসেছে? ভোক্কস?

আমি বললাম, হুঁ।

শাওন বলল, তুমি কি শনিগ্রহ চেন?

আমি বললাম, কেন চিনব না? শনিগ্রহ হচ্ছে সৌরমণ্ডলের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। পৃথিবীর চেয়ে ৯৫ গুণ বেশি ভারি। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ৮৮৬ দশমিক ৭ মিলিয়ন মাইল। সৌরজগতের এটিই একমাত্র গ্রহ যার চারদিকে আংটির মতো আছে।

==========

শাওন বলল, বুঝলাম তুমি বিরাট জ্ঞানী। তুমি কি জানো এই শনিগ্রহ আমাদের বাসায় দাখিল হতে যাচ্ছে ?

'তার মানে ?'

শাওন বলল, শনিগ্রহ হলো ভোক্কস। দেখবে এই ভোক্কস এখন প্রায়ই আসবে। আমাদের জীবন অস্থির করে তুলবে।

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম। কথাটা মনে হয় সত্যি।

তোমরা কি বুঝতে পারছ শনিগ্রহের সঙ্গে ভোক্কসকে কেন মেলানো হচ্ছে ? প্রাচীনকাল থেকেই শনিগ্রহকে অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। যার কোনো কারণই নেই। বাংলাদেশে শুধু শনি না, মঙ্গলবারকেও খারাপ ভাবা হয়। যদিও শনিবার ইহুদিদের জন্যে অতি শুভ। ঐ দিনটি তাদের প্রার্থনার দিন।

আমাদের সমবেত প্রার্থনার দিন হলো শুক্রবার। খ্রিস্টানদের রবিবার। একেক ধর্ম একেক বারকে নিয়ে নিয়েছে, এর কারণ কি কে জানে।

কত কায়দা করে তোমাদের নানান জিনিস শেখাচ্ছি বুঝতে পারছ ? তবে আমার কাউকে কিছু শেখাতে ভালো লাগে না। শিখতেও ভালো লাগে না।

এই অধ্যায় থেকে কী কী শিখলে তার পরীক্ষা

১. শরৎকালে কোন ফুল ফোটে ?
২. সংসদে এমপিদের প্রধান কাজ কি ?
৩. গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এবং গুরুত্বহীন মানুষ চেনার উপায় কি ?
৪. পারদ বিষাক্ততা কি ?
৫. রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম ছড়াটি কি ?
৬. সৌরমণ্ডলের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহের নাম কি ? এই গ্রহ পৃথিবী থেকে কতগুণ বড় ?
৭. মার্ফির সূত্র বর্ণনা কর।

আজ শুক্রবার ছুটির দিন।

আমার পরিকল্পনা সবাইকে নিয়ে নুহাশ পল্লীতে যাব। নুহাশ পল্লীতে ছোট্ট একটি সুইমিং পুল আছে। সেখানে পানি দেওয়া হয়েছে। পানিতে সবাই কিছু সময় দাপাদাপি করব। রাতে থাকব। একটা ছবি দেখব। ফিরব পরদিন।

নুহাশ পল্লীর ম্যানেজার টেলিফোন করে জানিয়েছে, সে একদিনের জন্যে একটা ঘোড়া ভাড়া করেছে। গাধা স্বভাবের ঘোড়া। নড়াচড়া করে না। চার পায়ে খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নিষাদকে ঘোড়ায় চড়িয়ে ছবি তোলা হবে। ব্যাপক পরিকল্পনা।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে— 'মানুষ পরিকল্পনা করে, ঈশ্বর তা ভণ্ডুল করে দেন।' ঘটনা তাই হলো। সকালবেলা গেটের দারোয়ান জানালো, এক ভদ্রলোক বেলুন নিয়ে এসেছেন। তার নাম ভোক্কস।

আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। শাওন বলল, মুখ কালো করে ফেলার কী আছে? ভদ্রলোক আসুক। কয়েকটা কথা বলে বিদায় করে দাও। তাকে বললেই হবে আমরা বেড়াতে যাচ্ছি। আমরা না হয় আধঘণ্টা দেরি করে বের হব।

ভোক্কসকে আসতে বলা হলো। নিষাদ তাকে দেখে উল্লাসিত। চেঁচিয়ে গলার রগ ফুলিয়ে ফেলল, আমার ভোক্কস মামা! আমার ভোক্কস মামা!

ভোক্কস মনে হয় বাচ্চাদের সঙ্গে তেমন মিশেনি। সে কিছুক্ষণ অস্বস্তি নিয়ে বসে রইল। আমার দিকে তাকিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল। আমি বললাম, ভাই আমরা তো আজ একটু বের হচ্ছি। আপনি অন্য আরেকদিন আসুন।

ভোক্কস কিছু বলার আগেই নিষাদ বলল, ভোক্কস মামাকে নিয়ে যাব। ভোক্কস মামাকে নিয়ে যাব।

আমি ভদ্রতা করে বললাম, আপনি কি যাবেন আমাদের সঙ্গে? আমরা নুহাশ পল্লীতে যাচ্ছি।

ভোক্কস বলল, যাব।

আমি মহাবিপদে পড়লাম। ইতস্তত করে বললাম, আমাদের কয়েকদিন থাকার পরিকল্পনা আছে। আপনি তো কাপড়-চোপড়ও সঙ্গে আনেননি।

ভোক্কস বলল, আমার অসুবিধা নাই।

আমার বিরক্তির সীমা রইল না। তোমরা হয়তো ভাবছ বিরক্ত কেন হচ্ছি? একজন গেস্ট যাবে তাতে সমস্যা কী?

কিছু সমস্যা আছে যা তোমরা বাচ্চারা বুঝবে না। পারিবারিকভাবে একটা জায়গায় যাচ্ছি, সেখানে হুট করে বাইরের কেউ গেলেই সমস্যা। গাড়িতে ব্যক্তিগত কথা বলা যাবে না। আলগা ভদ্রতা করতে হবে।

আমরা নুহাশ পল্লীতে পৌঁছলাম। নিষাদ ভোক্কস মামাকে নিয়ে সুইমিং পুলে নেমে গেল। ভোক্কস শার্ট-প্যান্ট পরেই নেমে পড়েছে। তার মুখভর্তি হাসি।

শাওন বলল, বাইরের এই লোকের সঙ্গে আমি সুইমিং পুলে নামব না। এত আগ্রহ করে এসেছিলাম সবাই মিলে সুইমিং পুলে ঝাঁপাঝাঁপি করব। তোমার ভোক্কস দিল ভজঘট করে। শাওন যেহেতু নামছে না আমিও নামলাম না। সুইমিং পুলের পাশে একটা ছাতিম গাছের নিচে বসে রইলাম। হাতে গল্পের বই। আমার বসে থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে— নিষাদের দিকে লক্ষ রাখা। কিছুই বলা যায় না, ভোক্কস তাকে হাত থেকে পানিতে ছেড়ে দিতে পারে।

ভোক্কস দেখি নিষাদকে এখন একের পর এক ছড়া শোনাচ্ছে। সেইসব ছড়া অদ্ভুত। যেমন—

হেকটা পট
ঘট ঘট
মট মট
কট কট
শট শট
পট পট
হেঘমকশপ পঘমকশপ।

নিষাদ ছড়া শুনে খুবই মজা পাচ্ছে এবং একটু পরপর গলা ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছে— পট পট! পট পট!

একঘণ্টা সুইমিং পুলে কাটিয়ে ভোক্কস নিষাদকে নিয়ে উঠে এল। কাজের মেয়ের হাতে তাকে দিয়ে আমার কাছে এসে বলল, যাই।

আমি বললাম, যাই মানে ? কোথায় যান ?

'ঢাকায়।'

'ঢাকায় যাবেন ? এখন ?'

'হ্যাঁ।'

'খাওয়া-দাওয়া করবেন না ?'

'না।'

'যাবেন কীভাবে ?'

'হেঁটে।'

'পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তা আপনি হেঁটে চলে যাবেন ?'

'জি। আমরা ভোক্কসরা সাত দিন সাত রাত ক্রমাগত হাঁটতে পারি।'

'তাই না-কি ?'

ভোক্কস বলল, আমাদের হাঁটা বিষয়ে একটা ছড়াও আছে—

সাত দিন সাত রাত করিয়া হন্টন
ভোক্কস শ্রেণী করে বিজল বণ্টন—

আমি বললাম, এর মানে কী ? বিজল বণ্টন কি ?

ভোক্কস বলল, এর অর্থ গোপন। প্রকাশ করা যাবে না। তবে আমি ভোক্কস সমাজ বিষয়ে কয়েকপাতা লিখে এনেছি। আপনার গাড়িতে রেখেছি। ইচ্ছা করলে পড়ে দেখতে পারেন।

'আপনি কি সত্যি চলে যাবেন ?'

'হ্যাঁ।'

'দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করুন। তারপর যাবেন। আমার গাড়ি পৌঁছে দেবে।'

ভোক্কস জবাব না দিয়ে হাঁটা ধরল। তার গায়ে ভেজা শার্ট-প্যান্ট। মাথার চুল বেয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। সে লম্বা লম্বা পা ফেলে রওনা দিয়েছে। একবারও পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে না।

আমার মনটাই খারাপ হলো। যে সঙ্গে আসায় বিরক্ত লাগছিল, এখন সে চলে যাচ্ছে দেখে খারাপ লাগছে। ব্যাপারটা তোমরা এখন পরিষ্কার বুঝবে না। যখন বড় হবে তখন বুঝবে। মানুষের মনে দ্বৈত ভাব প্রবল। একই সঙ্গে কোনো বিষয় আমাদের ভালো লাগে আবার খারাপও লাগে। পুরো বিষয়টাই করে আমাদের ব্রেইন। ব্রেইন হয়তো-বা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারে না।

ভোক্কস চলে গেছে— এই বিষয়টি নিষাদ জানে না। সে খেয়ে লম্বা একটা ঘুম দিয়ে সন্ধ্যার পর উঠল। এবং ব্যস্ত হয়ে পড়ল জোনাকি নিয়ে। নুহাশ পল্লীতে প্রচুর জোনাকি। সন্ধ্যার পর তারা ঝাঁক বেঁধে বের হয়। তারা আলো জ্বালে এবং নেভায়, দেখার মতো দৃশ্য।

ইংরেজিতে জোনাকি পোকাকে বলে আগুনের মাছি (Fire Flies)। কী বিশ্রী নাম, তাই না? বাংলা নামটা অদ্ভুত সুন্দর। জোনাকি। নিষাদ জোনাকির ঝাঁকের পেছনে ছোটাছুটি করছে, আমি বারান্দায় বসে তার আনন্দ দেখছি আর ভাবছি নানান কারণে আমাদের মধ্যে প্রবল আনন্দের অনুভূতি হয়। অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গ জোনাকি! তারও কি হয় ? তাদের জগৎটা কেমন ? কিছুক্ষণের জন্যে জোনাকি পোকা হলে তাদের মনের ভাব বোঝা যেত।

রাতে আমাদের ছবি দেখার কথা। ছবি না দেখে গাড়িতে রেখে যাওয়া ভোক্কসের খাতা নিয়ে বসলাম। সে কী লিখেছে পড়ে দেখা দরকার।

খুব সুন্দর হাতের লেখাকে আমরা কী বলি তা নিশ্চয়ই জানো। আমরা বলি, মুক্তার মতো লেখা। এই উপমা কিন্তু ঠিক না। আসল মুক্তা এবড়ো-থেবড়ো। পরে তাকে পালিশ করে গোল বানানো হয়।

যাই হোক, আমাদের ভোক্কসের হাতের লেখা যেন কম্পিউটারের প্রিন্ট-আউট দেয়া। যে-ই দেখবে সে-ই বলবে— বাহ্! সে লিখেছে—

ভোক্কস কথা

আমরা ভোক্কসরা মানব জাতির বন্ধু। যখন রাক্ষস-খোক্কসরা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে তখন আমরা মানুষের পক্ষ নেই। আমাদের সাহায্য ছাড়া মানুষের যুদ্ধে জেতা ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

কারণ রাক্ষস-খোক্কস মৃত্যুহীন প্রাণী। তাদের জীবন ভোমরার শরীরে। সেই ভোমরা রাখা হয় পাতালে সোনার কৌটায়। মানুষের পক্ষে পাতালে প্রবেশ করে রাক্ষস-খোক্কস মারা সম্ভব ছিল না। আমাদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তবে আমরা এখানে এক চালাকি করি। মৎস্যকন্যাদের নিজেদের দলে নিয়ে নেই। তারাই আমাদের পাতালের ভোমরা এনে দিত। বিনা শর্তে যে দিত তা কিন্তু না। তাদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে যখন রাক্ষস-খোক্কস সম্প্রদায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে তখনই ভোক্কসরা মৎস্যকন্যাদের বিয়ে করবে।

এই পর্যন্ত পড়ে আমি বললাম, বদ্ধ উন্মাদ। শাওন বলল, কে বদ্ধ উন্মাদ ?

আমি বললাম, তুমি পড়ে দেখ তাহলেই বুঝবে কে উন্মাদ। আমাদের ভোক্কস। নিষাদের ভোক্কস মামা।

সে বলল, আমি ছবি দেখব। ভোক্কসের লেখা পড়ার কিছু নেই। ভোক্কস তুমি জুটিয়েছ। তুমি তার মহান সাহিত্য পড়বে।

আমি বললাম, দশ মিনিট পড়। প্রথম দু'টা পাতা।

সে পড়ল এবং শব্দ করে হাসতে লাগল। আমি বললাম, তোমার কি মনে হয় না তার চিকিৎসা দরকার ?

শাওন বলল, ভোক্কস চিকিৎসার অতীত। চিন্তা করতেই কেমন লাগছে, ভোক্কস মৎস্যকন্যাকে বিয়ে করে সাগর তীরে বাড়ি বানিয়ে বাস করছে। তার মাছের মতো লেজওয়ালা ছেলেপুলে হয়েছে। তারা ছোটাছুটি করে খেলছে।

এই সময় নিষাদের আকাশ ফাটানো চিৎকার শুনলাম। ভয়ংকর কিছু ঘটেছে ভেবে ছুটে বারান্দায় গিয়ে দেখি, ভোক্কস তাকে কোলে নিয়ে ঘুরছে। আমি বললাম, কী ব্যাপার ?

ভোক্কস বলল, নিষাদের জন্যে খারাপ লাগছিল বলে চলে এসেছি। বোর্ড বাজার পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম।

আমি বললাম, দুপুরে খাননি। নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। আসুন কিছু খেয়ে নিন।

'পরে খাব।'

সে নিষাদকে ঘাড়ে নিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে রওনা হলো। শাওন ফিসফিস করে বলল, পাগল মানুষ। নিষাদকে নিয়ে যাচ্ছে— আমার তো খুবই ভয় লাগছে।

ভয় আমারও লাগছিল। আমি নুহাশ পল্লীর ম্যানেজারকে ওদের পেছনে পাঠিয়ে আবার ভোক্কসের খাতা খুললাম। সে লিখেছে—

রাক্ষস-খোক্কস নানান আকারের এবং নানান প্রকৃতির হয়। কিছু কিছু হয় পর্বতের মতো প্রকাণ্ড। এদের বুদ্ধি কম। তবে রাগ বেশি। এরা পানিতে সাঁতার দিয়ে ভাসতে পারে না। যুদ্ধে এদের হারানো ছিল সবচেয়ে সহজ। আড়ালে বসে বলতে হতো আমরা সমুদ্রে বসে আছি। আয় দেখি যুদ্ধ কর।

তারা সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের দিকে ছুটতো। সমুদ্রে ডুবে নিস্তেজ হয়ে যেত। শুকনায় উঠে আসার মতো বুদ্ধি তাদের ছিল না।

একদল রাক্ষস খোক্কস ছিল দেখতে অবিকল মানুষের মতো। এরাই ছিল ভয়ঙ্কর। এরা মানুষের মধ্যেই বাস করতো। এদের চেনা যেত না।

আমরা ভোক্কসরাও মানুষের মতো। আমরা তিনটা নীতি মেনে চলতাম। এই তিনটা নীতির নাম ভোক্কস ত্রি-প্রতিজ্ঞা।

১. আমরা মিথ্যা বলব না। জীবন সংশয় হলেও বলব না।
২. মানুষের কখনো কোনো ক্ষতি করব না।
৩. রাক্ষস-খোক্কসদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করব।

আমি পড়া বন্ধ করে ভাবছি—একজন মানুষের মাথা কতটুকু খারাপ হলে এ ধরনের লেখা লিখতে পারে। যা লিখছে তা-কি সে বিশ্বাস করছে? মানসিক রোগীরা অনেক অবাস্তব জিনিস বিশ্বাস করে। 'বাস্তবতা' বিষয়টা তাদের মধ্যে থাকে না। আমার নানাবাড়িতে (মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা) আলাউদ্দিন নামে নানাজানের এক কামলা ছিল। দিব্যি ভালো মানুষ। কাজকর্ম করে। সন্ধ্যাবেলা গানের আসরে গান শুনতে যায়। যাত্রা দেখতে যায়। তার সঙ্গে কথাবার্তা বললে কেউ বুঝবে না সে মানসিক রোগী। আমার শৈশবে সে আমাকে সুন্দর সুন্দর গল্প শুনিয়েছে। নেত্রকোনা অঞ্চলে এইসব গল্পের নাম 'কিচ্ছা-কাহিনী'। গল্পগুলিতে অনেক গান থাকতো। সেইসব গান সুর করে গাইতে হতো। আলাউদ্দিনের গলায় সুর ছিল। গল্পের গানগুলিও সে সুন্দর করে গাইতো।

তার একটাই সমস্যা। সে বিশ্বাস করতো একটা পরীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। পরীর নাম— 'ছেরযা'। এই পরী না-কি প্রতি পূর্ণিমার রাতে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। পূর্ণিমার রাতে আলাউদ্দিন খুব অস্থির থাকতো। নানাবাড়ির পেছনেই ঘন জঙ্গল। সে ঢুকে যেত জঙ্গলে। বাড়ি ফিরত পরদিন সকালে। তখন তার চোখ লাল। ছেরযা পরী না-কি অপূর্ব সুন্দরী। বড় বড় চোখ। গায়ের রঙ শরৎকালের কাশফুলের মতো শাদা। তবে দাঁতগুলি মানুষের দাঁতের মতো না। কুকুরের দাঁতের মতো চোখা চোখা। যে কারণে পরীকে হাসতে দেখলে ভয় লাগে। আর তার গায়ে মাছের গন্ধের মতো আঁশটে গন্ধ।

তোমরা কেউ আবার ভেবে বসো না যে সত্যি সত্যি তার কাছে পরী আসত। যদিও নানাবাড়ির কেউ কেউ বিশ্বাস করত। মানুষের জীবনে অদ্ভুত ঘটনা কখনো ঘটে না বলেই তারা 'অদ্ভুত' বিশ্বাস করতে ভালোবাসে।

আমি অনেক শিক্ষিত মানুষ দেখেছি যাদের বিজ্ঞানের নানান শাখায় Ph D-র মতো ডিগ্রি আছে, তাদেরকেও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করতে দেখেছি।

==========

যাই হোক, এখন ভোক্কসের গল্পে ফিরে যাই। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি ভোক্কসকে নিয়ে প্যাগোডা ঘরে বসলাম। বুদ্ধ মন্দিরকে বলে প্যাগোডা। নুহাশ পল্লীতে কোনো বুদ্ধ মন্দির নেই। নুহাশ পল্লীর ঠিক মাঝখানে প্যাগোডার মতো বানানো টিনের একটা ঘরকে বলা হয় প্যাগোডা ঘর। যেখানে দাবা খেলা হয়।

রাত দশটার মতো বাজে। কৃষ্ণপক্ষ। আকাশে চাঁদ নেই। তবে তারায় তারায় আকাশ ঝলমল করছে। প্যাগোডা ঘরে বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা নেই বলে ঘর অন্ধকার। নুহাশ পল্লীর বাগানে বাতিগুলি জ্বলছে। কামিনী ফুলের ঝাড়ে কামিনী ফুল ফুটেছে। মাঝে মাঝে বাতাসে ফুলের সৌরভ ভেসে আসছে। গল্প করার চমৎকার পরিবেশ। একটাই শুধু সমস্যা। অন্ধকার বলে আমি ভোক্কসের মুখ দেখতে পারছি না। আমার আবার গল্প করার সময় যার সঙ্গে গল্প করছি তার মুখ দেখা খুবই জরুরি। এই কারণেই টেলিফোনে আমি কথা বলতে পারি না। মুখ দেখা যায় না, কী কথা বলব ? আমি 'হ্যালো' বলেই রেখে দেই।

ভোক্কস শব্দ করে হাই তুলছে। মনে হয় তার ঘুম পাচ্ছে। আমি বললাম, আপনার লেখা কয়েক পাতা পড়েছি। কিছু প্রশ্ন ছিল, করব ?

'হুঁ।'

'আপনার সঙ্গে কি কোনো মৎস্যকন্যার পরিচয় হয়েছে ?'

ভোক্কস বিরক্ত গলায় বলল, রাক্ষস-খোক্কস সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলে তবেই না মৎস্যকন্যাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে। তার আগে কীভাবে হবে ?

আমি বললাম, রাক্ষস-খোক্কস এখনো আছে ?

'হুঁ।'

'বলেন কী ?'

ভোক্কস বলল, আপনি এমন চমকে উঠলেন কেন ? আপনি নিজে জানেন না যে রাক্ষস-খোক্কস আছে ?

আমি বললাম, সত্যি আমি জানি না।

ভোক্কস বলল, আপনি ঠিকমতো খবরের কাগজ পড়েন না। পড়লেই জানতেন। প্রতিদিনই তো খবরের কাগজে কোনো না কোনো রাক্ষস-খোক্কসের খবর ছাপা হচ্ছে। আজও তো এক খোক্কসের খবর ছাপা হলো।

'কোন খবরটা ?'

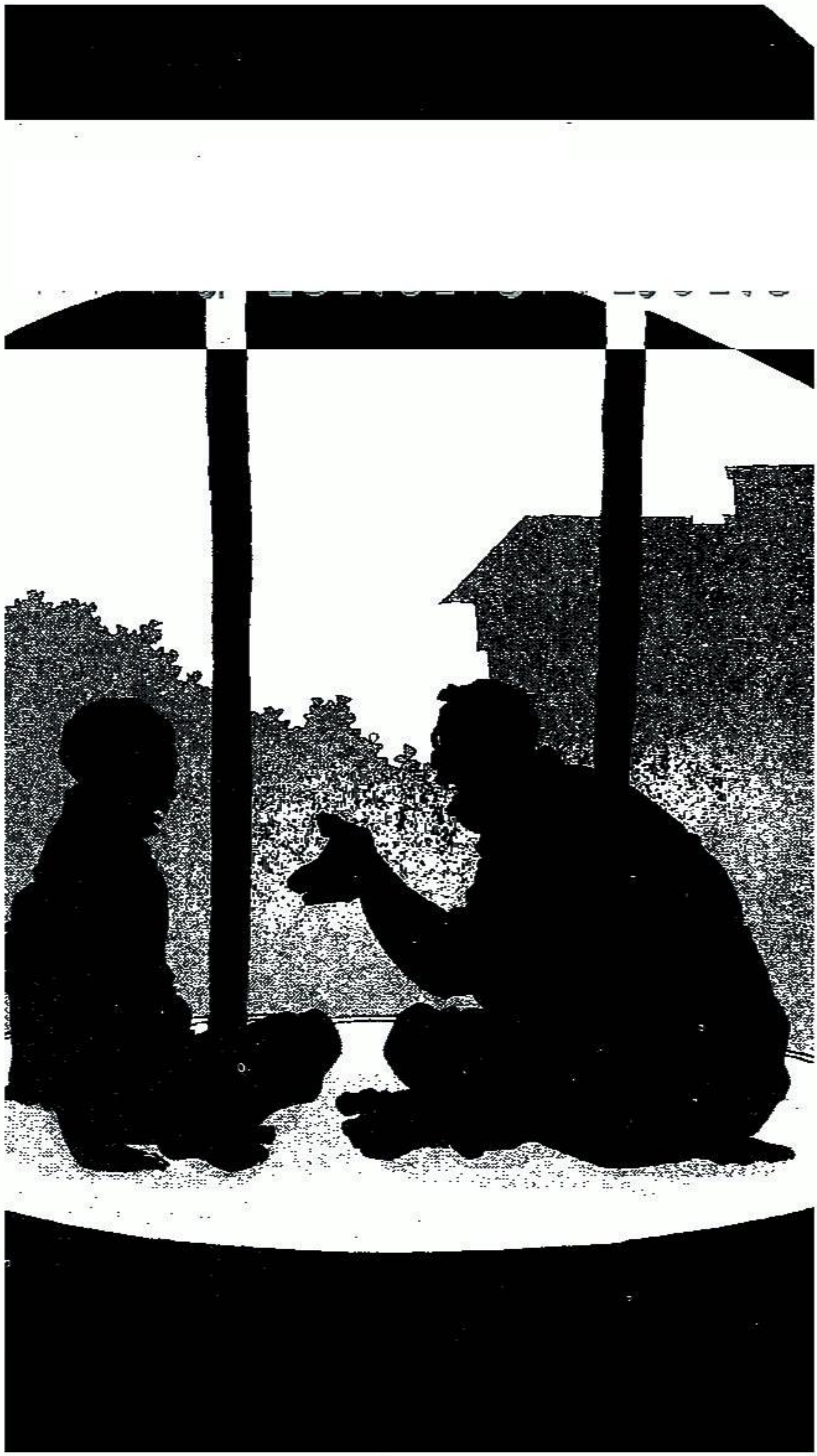

'রসু খাঁ বলে একজনের কথা ছাপা হয়েছে। যে দশটা মেয়েকে খুন করেছে। আপনার কি ধারণা সে মানুষ ? মোটেই না। সে হলো মানুষের রূপ-ধরা এক খোক্কস।'

'ও আচ্ছা।'

'জ্যাক দ্য রিপার নামে লন্ডনে একজন খোক্কস ছিল। সে একশ'র বেশি মানুষ মেরেছে। লোকে বলে সে সিরিয়াল কিলার, আসলে খোক্কস।'

'এরা তাহলে খোক্কস ?'

'হ্যাঁ। রাক্ষসরা মানুষ মেরে তার মাংস খাবে।'

'ও আচ্ছা।'

ভোক্কস আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বলল, পত্রিকা পড়েন না ?

'পড়ি।'

'জার্মানির জোয়াসিম ক্রলের নাম পড়েছেন ?'

'না।'

'সে মানুষ মারত তারপর তাদের কেটেকুটে খেয়ে ফেলত। সে হচ্ছে রাক্ষস। খোক্কস না।'

আমি কথা বললাম না। ভোক্কস গলা নামিয়ে বলল, আমেরিকার রিচার্ড ট্রেন্টন চেজ নামে একজন রাক্ষস ছিল। সে মানুষ মেরে তার রক্ত খেত। সেও রাক্ষস, খোক্কস না। বুঝতে পারছেন ?

'এখন বুঝলাম।'

ভোক্কস বলল, আপনি কিছুই বুঝেন নি। আপনি ভাবছেন আমার মাথা খারাপ। বানিয়ে বানিয়ে এইসব বলছি। তাই ভাবছেন না ? সত্যি করে বলুন তো ?

আমি চুপ করে রইলাম। ভোক্কস বলল, যেসব রাক্ষস-খোক্কসের কথা বললাম এরা মোটেই ভয়ঙ্কর না।

'ভয়ঙ্কর কারা ?'

'তাদের কথা আজকে বলতে ভালো লাগছে না। আরেকদিন বলব।'

আমি বললাম, ঠিক আছে আরেকদিন শুনব। আজ বরং নিশি যাপন করি। কামিনী ফুল ফুটেছে। কী সুন্দর ঘ্রাণ!

ভোক্কস বলল, আমাদের ঘ্রাণশক্তি নাই। আমরা ঘ্রাণ পাই না। রাক্ষস-খোক্কসদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। ওরা মানুষের গন্ধ পেলেই বলে, 'হাউ মাউ খাউ মানুষের গন্ধ পাউ।' আমাদের ঘ্রাণশক্তি নেই বলেই আমরা মানুষের গন্ধ পাই

==========

না, রাক্ষস-খোক্কসদের গন্ধও পাই না। যার কারণে কে মানুষ কে রাক্ষস তা বুঝতে পারি না। যাই হোক, এখন আমি ঘুমাব। বলেই সে প্যাগোডা ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার নাক ডাকতে লাগল। মনে হয় ভোক্কসরা দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

রাতে নিষাদ অনেক যন্ত্রণা শুরু করল। সে ভোক্কস মামার সঙ্গে ঘুমাবে। আমাদের সঙ্গে ঘুমাবে না। নিষাদ তার ছোট্ট বালিশ নিয়ে তৈরি। সে একা একা চলে যাবে।

আমি বললাম, তুমি অবশ্যই ভোক্কসের সঙ্গে ঘুমাবে না। অপরিচিত কারোর সঙ্গে ঘুমাতে হয় না।

নিষাদ বলল, তুমি আমার সঙ্গে জোরে কথা বলবে না। তোমাকে আমি বকা দিব। তুমি বকা বকা বকা।

নিষাদের বকা দেয়াটা বেশ মজার। যাকে সে বকা দিতে চায় তার দিকে তাকিয়ে সে বলে, বকা, বকা, বকা।

তাকে ভোক্কসের পাশে শুইয়ে দিতে বাধ্য হলাম। সে ভোক্কসের গায়ে পা তুলে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি বসে আছি। পুত্রের ঘুম গাঢ় হলে তাকে নিয়ে যাব। সে ঘুমাবে বাবা-মা'র মাঝখানে। ভোক্কসের সঙ্গে না।

কী জানলাম ?

১. সুন্দর হাতের লেখাকে কি বলে ?
২. আগুনের মাছি কি ?
৩. মানসিক রোগীর লক্ষণ কি ?
৪. প্যাগোডা কি ?
৫. জ্যাক দ্য রিপার কে ?
৬. মানুষের মনের দ্বৈত ভাবটা কেন হয় ?

নুহাশ পল্লীতে চব্বিশ ঘণ্টার ভ্রমণ শেষ। এখন ঢাকায় ফিরব। মালপত্র গাড়িতে তোলা হয়েছে। আমি ভোক্কসকে বললাম, আসুন। গাড়িতে উঠুন।

ভোক্কস বলল, আপনারা রওনা হয়ে যান। আমি হেঁটে যাব।

আমি বললাম, হেঁটে যেতে হবে কেন ?

ভোক্কস বলল, আমার হাঁটতে ভালো লাগে। আমি হেঁটেই যাব।

সঙ্গে সঙ্গে নিষাদ বলল, আমিও ভোক্কস মামার সঙ্গে হেঁটে যাব।

নিষাদের মুখে এই কথা শুনে আমি মোটেও আশ্চর্য হলাম না। বাচ্চারা বড়দের কথা শুনে কথা বলতে ভালবাসে। আশ্চর্য হলাম ভোক্কসের কথা শুনে। সে বলল, আপনারা রওনা দিন। আমি নিষাদকে ঘাড়ে বসিয়ে হাঁটব। বাচ্চা মানুষ তো হাঁটতে পারবে না।

শাওন কঠিন গলায় বলল, ওকে ঘাড়ে করে আপনার হাঁটতে হবে না। দয়া করে অদ্ভুত কথা বলবেন না।

ভোক্কস বলল, তাকে ঘাড়ে করে হাঁটতে আমার মোটেই অসুবিধা হবে না। এতটুক বাচ্চা। তার আর কী ওজন।

এ ধরনের কথাবার্তা যারা বলে তাদের সঙ্গে তর্কে যাওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ না। আমি নিষাদকে জোর করে গাড়িতে তুলে রওনা হলাম। সে চিৎকার করতে লাগলো— 'ভোক্কস মামার সঙ্গে যাব। ভোক্কস মামার সঙ্গে যাব।' বাবা-মা'দের আনন্দ দেবার ক্ষমতা ছোটদের যেমন অসাধারণ আবার তাদের বিরক্ত করার ক্ষমতাও ছোটদের অসাধারণ। নিষাদ সেই কাজটি করতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় হেঁচকি তুলতে তুলতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙ্গার পর সে স্বাভাবিক। একবারও সে ভোক্কস মামার প্রসঙ্গ তুলল না। তিন বছরের নিচের শিশুদের স্মৃতি হল সাময়িক স্মৃতি। ইংরেজিতে বলে short term memory. যে কোনো ঘটনাই তাদের কিছুক্ষণ মনে থাকে।

আমরা যে স্বপ্ন দেখি তার স্মৃতিও কিন্তু সাময়িক। স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভাঙলে স্বপ্নটা মনে থাকে, এরপর আর মনে থাকে না।

এই ফাঁকে বলে নেই স্বপ্নের ব্যাপারে আমার খুব কৌতূহল আছে। বিছানার পাশে একটা বাঁধানো খাতা এবং কলম রেখে আমি ঘুমাই। স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলেই আমি টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে স্বপ্নটা লিখে ঘুমিয়ে পড়ি। দিনের বেলা খাতা খুলে স্বপ্ন পড়ে খুব অবাক হই। এই কাজটা তোমরাও করতে পার। তাহলে অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্নের কথা পড়ে নিজেরাও মজা পাবে। খাতায় লেখা একটা স্বপ্ন তোমাদের বলি—

স্বপ্নে দেখলাম, 'একগাদা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তাদের সবার মাথায় পাখির পালকের তৈরি টুপি। হঠাৎ বাতাস এসেছে— সবার মাথার টুপি বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। বাচ্চারা টুপির পেছনে পেছনে ছুটছে। তারা ছুটতে ছুটতে গহিন গিরিখাদের সামনে এসে দাঁড়াল। এক পা এগুলেই সবাই নিচে পড়ে যাবে।' এই পর্যন্ত দেখেই ভয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি স্বপ্ন লিখে ফেললাম।

এখন মূল গল্পে ফিরে যাই। ঢাকায় এসে গেটের দারোয়ানকে বলে দিলাম ভোক্কস নামের কেউ যদি আমার বা নিষাদের খোঁজে আসে তাহলে তাকে যেন বলা হয় আমরা দু'জন বাসায় নেই।

মিথ্যা কথা বলতে বলা হচ্ছে। তোমরা হয়ত এর মধ্যেই লক্ষ করা শুরু করেছ যে বড়রা মাঝেমধ্যেই মিথ্যা বলে। আবার ছোটরা কোনো মিথ্যা বললে তারা খুবই রাগ করে।

আমার কাছে কিন্তু সব মিথ্যা, মিথ্যা না। কিছু মিথ্যা সত্যির চেয়েও সত্যি। তোমাদের উদাহরণ দিয়ে বুঝাই। মনে কর তুমি নির্জন এক বাগানে খেলছ। হঠাৎ এক লোক দৌড়ে এসে খড়ের গাদায় ঢুকে লুকিয়ে পড়ল। কারণ কয়েকজন ডাকাত তাকে ধরার জন্যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পেছনে পেছনে আসছে। তারা তোমাকে দেখে বলল, খুকি (কিংবা খোকা) একটা লোক এই দিকে ছুটতে ছুটতে এসেছে। কোন দিকে গিয়েছে জান ?

এখন তুমি যদি সত্যি কথা বল এবং খড়ের গাদা দেখিয়ে বল— 'এইখানে লুকিয়েছে'। তাহলে ডাকাতরা তাকে মেরে ফেলবে। তুমি যদি মিথ্যা করে বল, আমি জানি না। তাহলে কিন্তু তার জীবন রক্ষা হয়। যে মিথ্যা বললে একজনের জীবন রক্ষা হয় সেই মিথ্যা কি সত্যির চেয়ে ভালো না ?

আমি কয়েকটা কারণে বাসার দারোয়ানকে মিথ্যা বলতে বলেছি।

==========

১. ভোক্কস একজন মানসিক রুগী। যখন তখন তাকে বাসায় আসতে দেয়া যায় না।
২. নিষাদ তার ভোক্কস মামার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত। তাদের এই বন্ধুত্ব বাড়তে দেয়া ঠিক হবে না।
৩. বেশির ভাগ সময় আমি বাসায় লেখালেখি করি। ভোক্কস এলে তাতে ছেদ পড়বে। আর লেখালেখি এমনই এক জটিল প্রক্রিয়া একবার বাধা পড়লে চট করে শুরু করা যায় না।

আমি ভোক্কসকে বাসায় প্রবেশ করা বন্ধ করে হয়ত খানিকটা অপরাধ বোধে আক্রান্ত হয়েছিলাম যে কারণে ঠিক করলাম তাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখব। শারীরিকভাবে সে আমার বাসায় ঢুকতে পারছে না কিন্তু মানসিক ভাবে ঢুকছে। এটাও তো খারাপ না।

আমি উপন্যাসটার নাম দিলাম—

'নিষাদের ভোক্কস মামা'

নিজের ছেলেমেয়েদেরকে চরিত্র বানিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখার বদ অভ্যাস আমার আছে। নিষাদের বড় ভাই নুহাশকে নিয়ে আমি একটা উপন্যাস লিখেছি। নাম—

'নুহাশ এবং আলাউদ্দিনের আশ্চর্য চেরাগ'

উপন্যাসটা পড়ে নুহাশ খুবই রাগ করেছিল। কারণ উপন্যাসের নুহাশ একটি মেয়ে, ছেলে না। নুহাশ গম্ভীর গলায় বলেছিল, বাবা ! আমি ছেলে না মেয়ে ?

আমি বললাম, ছেলে।

সে বলল, তাহলে তুমি আমাকে মেয়ে বানিয়েছ কেন ? সরি বল।

আমি বললাম, সরি।

তার রাগ মিলিয়ে গেল। বাচ্চাদের 'সরি' বললে সব মিটমাট হয়ে যায়। বড়দের বেলায় তা কিন্তু হয় না। যে রাগ করেছে সরি বলার পরেও সে রাগ করেই থাকে।

এখন ভোক্কস মামা নিয়ে উপন্যাসটার কথা বলি— শুরু করেছি এই ভাবে। পড়ে দেখ তো তোমাদের কেমন লাগে। উপন্যাসে নিষাদের বয়স একটু বাড়িয়েছি। তার বয়স করেছি চার বছর। সে একটা ইংরেজি স্কুলে নার্সারিতে পড়ে। তার জন্মদিনের অনুষ্ঠান দিয়ে উপন্যাসের শুরু।

==========

"আজ সন্ধ্যায় নিষাদ চার বছরে পড়বে। চার বছর আগে ঠিক এই দিনে সন্ধ্যা সাতটা ছাব্বিশ মিনিটে নিষাদ গুটিসুটি মেরে তার মায়ের পেটে ঘুমাচ্ছিল। তার ঠিক এক মিনিট পর অর্থাৎ সাতটা সাতাশ মিনিটে ডাক্তাররা তার মা'র পেট কেটে নিষাদকে বের করলেন। বেচারা আরাম করে মা'র পেটে চোখ বন্ধ করে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গায় সে খুবই বিরক্ত হল। যে ডাক্তার তাকে বের করেছেন তার উপরও সে বিরক্ত হল। কারণ ডাক্তার তাকে পা ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। সে তার বিরক্তি প্রকাশ করার জন্যে বিকট শব্দে কাঁদতে লাগল। কান্নার শব্দের সঙ্গে বিড়ালের কান্নার মিল আছে।

ওয়াউ। মিয়াউ। ওয়াউ। মিয়াউ।

ডাক্তার ঝুলন্ত নিষাদকে তার মা'র কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, দেখুন কি সুন্দর ছেলে।

নিষাদের মা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ডাক্তার আপনি আমার ছেলেটাকে উল্টা করে ধরে রেখেছেন কেন ? বাবুটার তো কষ্ট হচ্ছে— বাবুয়ারে... ও আমার বাবুয়া।

হাসপাতালের এই বিশেষ সময়টি মনে রাখার জন্যে আজ বাসায় এক বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। নিষাদের বাবা একজন লেখক তো, এই কারণেই তার মাথায় অদ্ভুত অদ্ভুত সব আইডিয়া খেলা করে।

বিশাল একটা কেক কেনা হয়েছে। নিষাদের হাতে কেক কাটার ছুরি। তাকে ডাক্তারদের মতো মাস্ক পরিয়ে দেয়া হয়েছে। সাতটা সাতাশ মিনিটে সে কেক কাটবে। কেকের ভেতর একটা পুতুল লুকিয়ে রাখা হয়েছে। পুতুল বের হলেই সে গাইবে—

Happy birth day to you...

গান পুতুলের ভেতর রেকর্ড করা। পুতুলের গায়ে ধাতব কোনো বস্তু লাগলেই পুতুল গান করবে।

সাতটা বেজে সাতাশ মিনিট হয়েছে। নিষাদ কেক কাটতেই পুতুলের গায়ে ছুরি লাগল। পুতুল অবিকল মানুষের মতো উঠে বসল। এ রকম কথা ছিল না। পুতুলের বসতে পারার কথা না। সে তার গায়ের কেক মুছতে মুছতে বলল, ব্যথা দিলে কেন ? সবাই হতভম্ব, এ রকম তো হবার কথা না। ব্যাটারি দেয়া পুতুলের জন্মদিনের গান গাওয়া উচিত।

নিশাদ বলল, তুমি কে ?

HAPPY

==========

পুতুল এক টুকরা কেক মুখে নিয়ে চিবুতে চিবুতে বলল, মিষ্টি কম। কে কিনেছে এই কেক ? ওয়াক থু।

নিষাদ আবার বলল, এই তুমি কে ?

পুতুল বলল, আমি তোমার ভোক্কস মামা। কাউকে বল, গরম পানি করতে। গরম পানি দিয়ে শাওয়ার নেব। সারা গায়ে কেক লেগে আঠা আঠা হয়ে গেছে।

এই পর্যন্ত লিখে আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। কারণ লেখাটা হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না তোমরা কি বলতে পারবে ?

আচ্ছা আমিই বলছি। লেখাটা বিশ্বাসযোগ্য না। ছয় ইঞ্চি সাইজের একটা প্লাস্টিকের পুতুল, কেন বলবে, আমি তোমার ভোক্কস মামা। আজগুবি গল্পে অনেক কিছু হয় কিন্তু তাতেও লজিক থাকতে হবে। তোমরা এলিস ইন ওয়ান্ডার ল্যান্ড পড়েছ ? খুব আজগুবি গল্প না ? কিন্তু লজিকে কোনো সমস্যা নেই। এলিসের কর্মকাণ্ড বিশ্বাসযোগ্য।

আমার গল্পের পুতুলের কর্মকাণ্ড বিশ্বাসযোগ্য না। সে আচরণ করছে ছয় ইঞ্চি সাইজের মানুষের মতো। গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে ছয় ইঞ্চি সাইজের একটা মানুষকে কেকের ভেতর ঢুকিয়ে রাখতে হবে। এখন কথা হচ্ছে ছয় ইঞ্চি সাইজের মানুষ নিষাদের বাবা-মা কোথায় পাবেন ?

কাজেই আমি গল্পটা ছিড়ে কুচি কুচি করলাম এবং মুখ ভোতা করে বসে রইলাম। গল্পটা অন্য কোনোভাবে শুরু করতে হবে। হুট করে লেখা যাবে না। বেশ কিছুদিন ভাবতে হবে। আমার ভাগ্য যদি ভালো হয় ঘুমের মধ্যে গল্পের আইডিয়া পেয়ে যাব।

তোমরা শুনলে অবাক হবে যে অনেক লেখক তাদের আইডিয়া স্বপ্নে পেয়েছিলেন। বিখ্যাত কবি আলেকজান্ডার পোপ— তাঁর একটি দীর্ঘ কবিতা স্বপ্নে পেয়েছেন।

বিজ্ঞানীদের বেলাতেও এটা সত্যি। রসায়ন শাস্ত্রের অতি বিখ্যাত এক বিজ্ঞানীর নাম কেকুলে (Kekule)। তিনি বেনজিন নামের একটি রাসায়নিক যৌগের গঠন বের করতে পারছিলেন না। দিনের পর দিন চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না। এক রাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমুতে গেলেন। হঠাৎ স্বপ্নে দেখেন—প্রকাণ্ড একটা সাপ। সাপটা নিজের লেজ কামড়ে ধরছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে। কেকুলের ঘুম ভাঙল। তিনি খাতা কলম নিয়ে বেনজিনের গঠন লিখলেন। স্বপ্নের সাপটাই তাকে বেনজিনের 'আংটি গঠন' বিষয়ে দেখিয়ে দিল।

==========

কয়েকদিন কাটল, আমি কিছুই লিখি না। ডিভিডি প্লেয়ারে নিষাদকে নিয়ে কার্টুন দেখি। টম অ্যান্ড জেরি। গান শুনি।

কোনো কারণে আমার যদি লেখালেখি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মোটামুটি ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে। খাওয়া কমে যায়, ঘুম কমে যায়। রাতে বিকট দুঃস্বপ্ন দেখি। বেশির ভাগ স্বপ্ন পরীক্ষা বিষয়ক। পরীক্ষা দিতে হলে বসে আছি। প্রশ্ন সহজ হয়েছে কিন্তু আমি কিছু লিখতে পারছি না। কলম দিয়ে কালি বের হয় না। আমার পকেটে অনেক কলম। কোনটাতেই কালি নেই। সব ছাত্র সুন্দর লিখে যাচ্ছে। আমি বসে আছি কলম হাতে।

লেখা বন্ধ হবার ব্যাপারটা লেখকদের প্রায়ই হয়। ইংরেজিতে এর একটা নাম আছে— 'Writers block'. এর কোনো সুন্দর বাংলা প্রতিশব্দ নেই। আমি একটা করেছি— 'লেখকবন্দ'।

লেখকবন্দ সমস্যা থেকে মুক্তির অনেক কৌশল আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে সমুদ্রতীরে বসে ঢেউ দেখা। সমুদ্রের বিরতিহীন ঢেউ এসে লেখকের পায়ে আছড়ে পড়বে। এই দৃশ্যে লেখকের 'বন্দ' কেটে যাবে। তিনি আবার ঢেউয়ের মতো বিরতিহীন লেখা শুরু করবেন।

সমুদ্রের কাছে যাওয়া বেশ খরচান্ত ব্যাপার। যাওয়া-আসা, হোটেল ভাড়া, খাওয়া-দাওয়া। অনেক দরিদ্র লেখক এত খরচ করতে পারেন না। তাদের জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা— হন্টন। অর্থাৎ ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটতে হবে। হাঁটার সময় মনে মনে বেজোড় সংখ্যা গুনতে হবে। যেমন- ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১... 'লেখকবন্দ' দূর করার এটা না-কি অমোঘ ঔষধ। আমি কোত্থেকে জানলাম ? অবশ্যই বই পড়ে। লেখকদের নিয়ে অনেক বইপত্র বাজারে আছে।

যে কথা বলছিলাম, লেখকবন্দ কাটানোর জন্যে আমি হন্টন ঔষধের সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথম দিনেই ভোক্কসের সঙ্গে দেখা। সে আগের বেঞ্চটায় মাথা নীচু করে বসে আছে। তাকে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। হাতে খবরের কাগজ নেই, পানির বোতল নেই। চোখে রোদ-চশমাও নেই। আমি কাছে গিয়ে বললাম, ভালো আছেন ?

ভোক্কস হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। আমি বললাম, অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা।

ভোক্কস বলল, আমি সর্বমোট আঠারোবার আপনার বাসায় ঢুকতে চেষ্টা করেছি। দারোয়ান ঢুকতে দেয়নি। যতবারই ঢুকতে চাই দারোয়ান বলে,

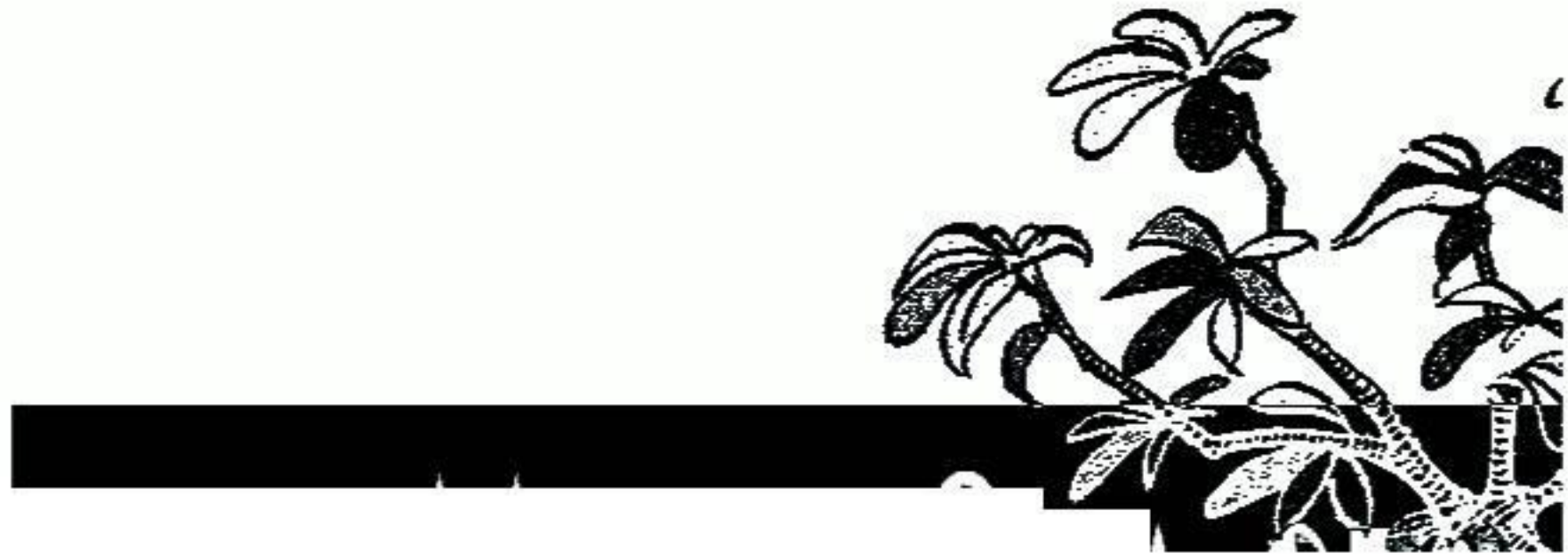

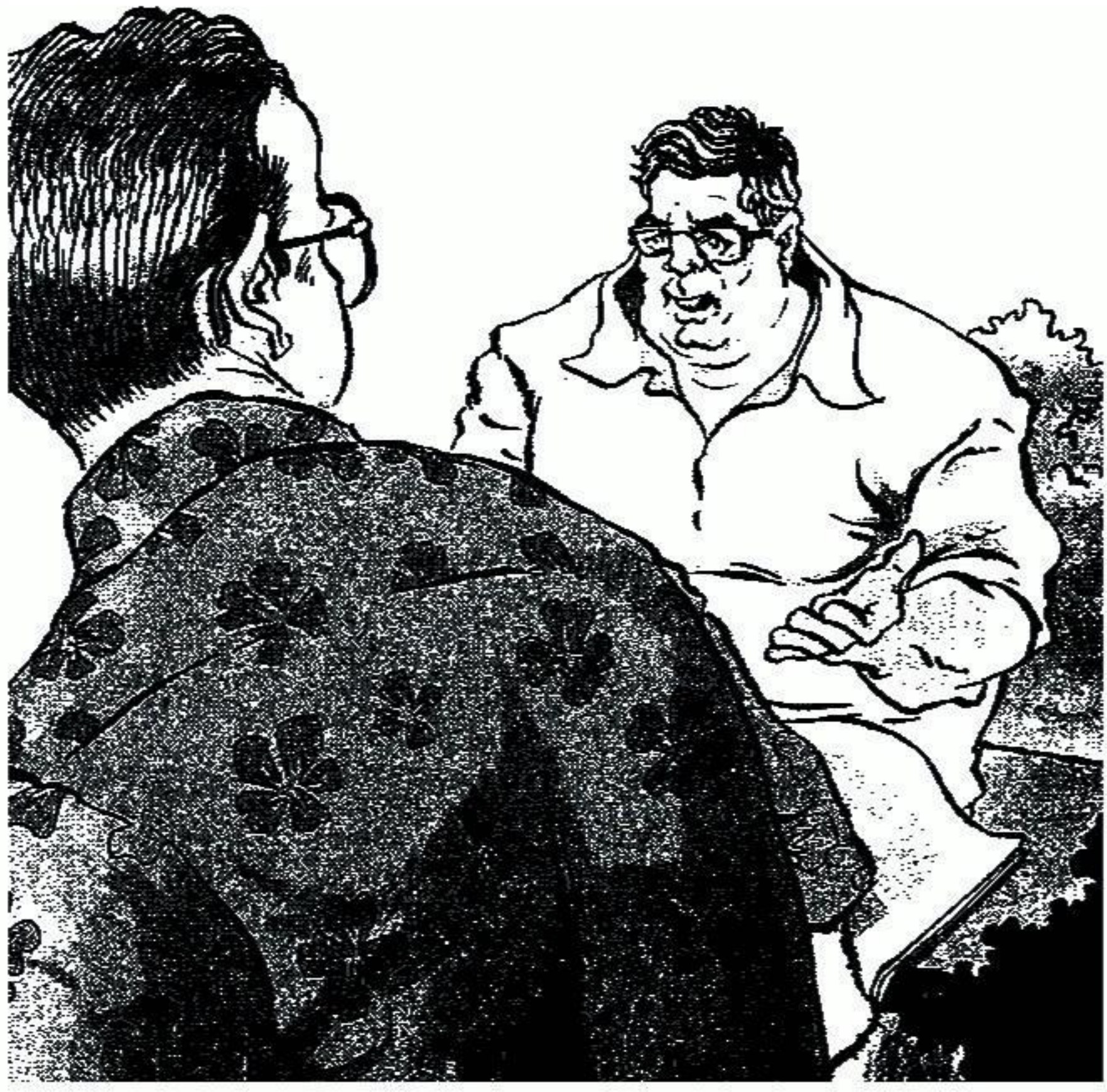

আপনারা কেউ বাসায় নেই। আজ সকালেও গিয়েছিলাম। দারোয়ান বলল, আপনারা সবাই রাজশাহী গিয়েছেন বেড়াতে। এখন দেখছি ঘটনা তা-না। আপনি ঢাকাতেই আছেন।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, দারোয়ানের দোষ নেই। আমি বড় একটা উপন্যাসে হাত দিয়েছি। দারোয়ানকে বলে দিয়েছি— কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে।

ভোক্কস বলল, আপনাকে বিরক্ত করতাম না। আমি নিষাদের কাছে যেতাম। তার সঙ্গে আমার দেখার বিষয়ে কি আপনার কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে।

আমি ভোক্কসের পাশে বসলাম। আমার মনে হল তাকে সত্য কথাটা বলা দরকার। সত্য ঢাকার জন্যে মিথ্যা বলা শুরু করলে একটার পর একটা মিথ্যা বলতেই হয়। মিথ্যা বাড়ে চক্রবৃদ্ধিতে।

চক্রবৃদ্ধি কি জান না ? ভালো ঝামেলায় পড়লাম তো। বাবাকে কিংবা মা'কে জিজ্ঞেস করে জেনে নিও। এখন মূল গল্পটা বলতে দাও।

আমি ভোক্কসকে বললাম, ভাই শুনুন। আমি এবং নিষাদের মা, দু'জনই চাই না আপনার সঙ্গে নিষাদের ঘনিষ্ঠতা হোক।

'কেন চান না ?'

আমি বললাম, আপনি মানব জাতির কেউ না। আপনি একজন ভোক্কস। নিষাদ মিশবে মানুষের সঙ্গে। ভোক্কসের সঙ্গে না। সে যদি আপনার মতো খবরের কাগজ খাওয়া শুরু করে সেটা কি ভালো হবে ?

ভোক্কস চুপ করে রইল। তাকে কিছুটা বিষণ্ন দেখাচ্ছে।

আমি বললাম, মনে করুন আপনার নিষাদের মতো একটি ছেলে আছে। তাকে আপনি নিশ্চয়ই ভোক্কসদের নিয়ম-কানুন শেখাবেন। সে সকালবেলা খবরের কাগজ খাবে। ডিকশনারি মুখস্ত করবে। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না, সে মানুষের সঙ্গে মিশে মানুষদের নিয়ম-কানুন শিখুক।

ভোক্কস জবাব দিল না। আমি বললাম, চা খাবেন ? চাওয়ালাকে চা দিতে বলি ?

'না।'

'আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন ? ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে আপনি কিন্তু রাগ করতে পারতেন না।'

'রাগ করি নি।'

'তাহলে বসি আপনার পাশে, কিছুক্ষণ গল্প করি ?'

ভোক্কস জবাব দিল না। লেকের দিকে তাকিয়ে রইল। একপর্যায়ে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। এই নিঃশ্বাসে আমার রাইটার্স ব্লক কেটে গেল। নিষাদ এবং ভোক্কস মামা উপন্যাসের ঘটনা মাথায় এসে গেল। প্রথম চ্যাপ্টারটা লিখতে শুরু করলাম। প্রথম চ্যাপ্টারের নাম— 'ভোক্কস মামার সঙ্গে পরিচয়'।

কী শিখলাম তার পরীক্ষা

১. সাময়িক স্মৃতি কাকে বলে ?
২. কখন মিথ্যা বললে দোষ নেই ?
৩. কোন কবি স্বপ্নে কবিতা পেয়েছিলেন ?
৪. বেনজিনের গঠন কোন বিজ্ঞানী বের করেছেন ?
৫. রাইটার্স ব্লক ব্যাপারটা কি ?

ভোক্কস মামার সঙ্গে পরিচয়
(প্রথম অধ্যায়)

নিষাদের স্কুল মর্নিং শিফট। সকাল সাতটায় শুরু হয় এগারোটায় শেষ। স্কুল ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বের হতে পারে না। বই খাতা গুছিয়ে খেলার মাঠে অপেক্ষা করতে হয়। গার্জিয়ানরা বাচ্চাদের নিতে আসেন। স্কুলের আয়া তখন একেক জনের নাম ধরে ডাকে।

'সুমনা আস! তোমার মা এসেছেন।'

'বকুল আস! তোমাকে নিতে বাবা এসেছেন।'

'হেনা আস! তোমাকে নিতে মা এসেছেন।'

আয়া এইভাবে যখন ডাকে তখন নিষাদের সামান্য মন খারাপ হয়। কারণ তাকে নিতে কখনো বাবা বা মা আসেন না। তাকে নিতে আসে ড্রাইভার। ড্রাইভারের নাম পিংকু।

নিষাদকে নিতে তার বাবা আসেন না, কারণ তার বাবা কোথাও যান না। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে না, বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে না, বিয়েবাড়িতে না, জন্মদিনের দাওয়াতে না। তাঁকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনি কোথাও যান না কেন ? তিনি বলেন, আমি গর্তজীবী মানুষ। গর্তে বাস করতেই আমার ভালো লাগে।

তিনি তাঁর বাসাটার নাম দিয়েছেন গর্ত। তিনি এই নিয়ে একটা ছড়াও বানিয়েছেন—

'বাইরে যাব মরতে ?
থাকব আমি গর্তে।'

নিষাদের মা শাওন নিজেও খুব ব্যস্ত থাকেন। তিনি একজন আর্কিটেক্ট। আর্কিটেক্টরা রাত জাগেন বলে তাদের অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমুতে হয়। তাঁর ঘুম ভাঙে সকাল দশটায়। তাড়াহুড়া করে এক কাপ চা খেয়ে মেকাপ নিতে বসেন। কারণ তিনি অভিনয়ও করেন। প্রায়ই তাঁর শুটিং থাকে। এক ঘণ্টার নাটক, ধারাবাহিক নাটক, টেলিফিল্ম, খণ্ড নাটক। কত কি যে আছে। আবার কোনো কোনো দিন থাকে গান রেকর্ডিং। তিনি নিষাদকে বলেছেন, সপ্তাহে একদিন আমি তোমাকে নিতে আসব আর একদিন আসবে তোমার বাবা। বাকি দিন ড্রাইভার নিতে আসবে। ঠিক আছে ?

নিষাদ বলেছে, ঠিক আছে।

কিন্তু, এতদিন পার হয়েছে তারা দু'জন একবারও আসেনি। স্কুলে থাকার সময় নিষাদ ঠিক করে, আজ বাসায় পৌঁছেই মাকে বকা দেবে। বলবে 'তোমাকে বকা বকা বকা।' বাসায় পৌঁছার পর তার আর বকার কথা মনে আসে না। সে খেলনা গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়ায়।

নিষাদের খেলনা গাড়িটা সত্যি গাড়ির চেয়েও ভালো। এই গাড়িতে হর্ন আছে। সাইরেন আছে। পায়ের কাছে বোতাম আছে। পা দিয়ে বোতাম চেপে ধরলে গাড়ি নিজে নিজে চলতে থাকে। কাউকে পেছন থেকে ঠেলতে হয় না। নিষাদ গাড়িতে চড়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায় এবং একটু পর পর হর্ন দেয়— পিপ পিপ পিপ।

তার বাবা বলেন, সারাক্ষণ হর্ন বাজিও না। দেখছ না লিখছি।

'লেখার সময় হর্ন বাজালে কি হয় বাবা ?'

'লেখা আটকে যায়।'

নিষাদ বলে, আর বাজাবো না বাবা। কিন্তু সে বাজাতেই থাকে। হর্ন না বাজালে গাড়ি একসিডেন্ট করবে। এই সাধারণ জিনিসটা বাবা কেন বোঝে না কে জানে।

এক বুধবারের কথা। তাদের স্কুল ছুটি হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা বাসায় যাবার জন্যে অপেক্ষা করছে। তখন হেনা নামের মেয়েটা দোলনা থেকে পড়ে গেল। তার নাক থেকে

রক্ত বের হতে লাগল। দোলনা ধাক্কা দিচ্ছিল নিষাদ। সে খুব আস্তে করেই ধাক্কা দিয়েছে। তারপরেও হেনা কেন যে পড়ে গেল। চারদিকে হইচই। গেটের আয়া ছুটে এল। মিসরা বের হলেন। তখন নিষাদ গেটের বাইরে চলে এল। কেউ তাকে বের হতে দেখল না। খেলার মাঠে তার খুব ভয় লাগছিল এই জন্যে সে গেট থেকে বের হয়েছে।

সে কিছুক্ষণ দৌড়াল। তারপর বড় রাস্তা পার হল। বড় রাস্তা পার হওয়া খুব কঠিন। সব সময় গাড়ি যাচ্ছে, রিকশা যাচ্ছে। রাস্তা পার হবার কঠিন কাজটা সে পারে কি-না তা পরীক্ষা করার জন্যেই রাস্তা পার হওয়া।

সে হাঁটতেই থাকল। হাঁটতেই থাকল। এখন তার খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে সে বড় হয়ে গেছে। শুধু বড়রাই একা হেঁটে বাড়ি যেতে পারে।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর নিষাদ বুঝতে পারল সে বাসা চেনে না। তাদের বাসার সামনে 'দখিন হাওয়া' নাম লেখা। সে অনেক বাসা দেখেছে তার কোনটিতেই 'দখিন হাওয়া' নাম লেখা নেই। দখিন হাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে হাওয়া দক্ষিণ দিক থেকে আসে। নিষাদের বাবা তাকে বলেছেন। আর উত্তর দিক থেকে যে হাওয়া আসে তাকে বলে উত্তরায়ন।

তার পানির পিপাসা পেয়েছে। স্কুল ব্যাগে পানির বোতল আছে। বোতলটা সে স্কুলের মাঠে ফেলে এসেছে। পানির পিপাসা ছাড়াও তার পিপি পেয়েছে। রাস্তায় কোনো বাথরুম নেই যে সে পিপি করবে। যখন ছোট ছিল তখন সে মাঝে মাঝে প্যান্টে পিপি করতো। এখন সে অনেক বড়। নার্সারিতে পড়ে। এখন প্যান্টে পিপি করলে সবাই বলবে নিষাদ পচা ছেলে।

রাস্তার পাশে একজন রিকশাওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। রিকশাওয়ালা বুড়ো। সিটে বসে বাদাম খাচ্ছে। তাকে দেখে নিষাদের মনে হল এইতো বুদ্ধি পাওয়া গেছে। রিকশায় করে বাসায় চলে যাওয়া যাবে। রিকশাওয়ালার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় নিষাদ জানে। মামা তাকে নিয়ে প্রায়ই রিকশায় করে ঘুরে বেড়ান। তাঁর কাছ থেকেই শেখা।

নিষাদের মামার নাম সুমন। সুমন হল যার মন ভালো। নিষাদ তার বাবার কাছ থেকে শিখেছে। নিষাদের শিখতে খুব ভালো লাগে। সে তার মামার কাছ থেকে রিকশা ভাড়া করা শিখেছে। প্রথমেই রিকশাওয়ালাকে বলতে হয়, এই রিকশা ভাড়া যাবেন ?

নিষাদ তার মামাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এই রিকশা কেন বল মামা ? সেতো রিকশা না মানুষ।

মামা বলেছেন, আমি তো তার নাম জানি না। নাম জানলে নাম ধরে ডাকতাম।

নিষাদ বলল, আগে নাম জেনে নাও না কেন মামা ?

মামা বললেন, এত সময় কোথায় ? আমাদের সময়ের বড়ই অভাব।

রাস্তার পাশে দাঁড়ানো রিকশার কাছে নিষাদ এগিয়ে গেল। রিকশাওয়ালা তাকাল তার দিকে। নিষাদ বলল, আপনার নাম কি ? তারপর ইংরেজিতে বলল, What is your name ?

নিষাদ স্কুলে অনেক ইংরেজি শিখেছে। তাদের মিস বলেছেন, সব সময় চেষ্টা করবে ইংরেজিতে কথা বলতে। তাহলে Spoken English ভালো হবে। Spoken English অর্থও নিষাদ জানে। কথা বলা ইংরেজি।

রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। নিষাদ আবার বলল, আপনার নাম কি ?

রিকশাওয়ালা বলল, সেলিম।

নিষাদ বলল, সেলিম আপনি ভাড়া যাবেন ?

'কই যাবে ?'

'বাসায় যাব।'

'বাসা কই ?'

নিষাদ বলল, বাসা কই জানি না। বাসার নাম দখিন হাওয়া। দক্ষিণ দিক থেকে যে হাওয়া আসে তাকে বলে দখিন হাওয়া। আর উত্তর দিকের হাওয়াকে বলে উত্তরায়ন।

'তোমার পিতা-মাতা কই ?'

'বাবা বাসায় আর মা মনে হয় শুটিংয়ে গেছে। মা একটা ঈদের নাটকে পাগলী সেজেছে। খুবই ভয়ংকর।'

রিকশাওয়ালা বলল, তুমি হারায়া গেছ ?

নিষাদ বলল, না।

এই সময় মোটা এক লোক ব্যাগভর্তি বাজার নিয়ে রিকশায় উঠে বসে বলল, চালা দেখি।

রিকশাওয়ালা বলল, কই যাবেন ?

লোকটা রাগী গলায় বলল, আগে রিকশা চালু কর। তারপর শুনবি কই যাব। ভাড়া যাব না বললে, থাপ্পড় দিয়া চাপার দাঁত ফালায়া দেব।

রিকশাওয়ালা বলল, স্যার! এই বাচ্চাটা হারায়া গেছে।

লোকটা বলল, হারায়া গেলে গেছে। চালা রিকশা।

নিষাদের সামনে থেকে রিকশা চলে গেল। আর তখনি নিষাদ দেখল, লেকের পাশের বেঞ্চে একটা সানগ্লাস পরা লোক বসে আছে। তার হাতে পানির বোতল। সঙ্গে সঙ্গে নিষাদের তৃষ্ণা অনেক বেড়ে গেল। তার কাছে মনে হল এক্ষুণি পানি না খেলে সে মরেই যাবে।

নিষাদ লোকটার কাছে এগিয়ে গেল। তার পাশে দাঁড়াল। কেউ পাশে এসে দাঁড়ালে তার দিকে তাকাতে হয়। সে বাচ্চা মানুষ হলে বলতে হয়, কি চাও খোকা ? লোকটা তাকাল না, কিছু বললও না। নিষাদ নিজ থেকে বলল, পানি খাব।

লোকটা নিষাদের দিকে না তাকিয়ে পানির বোতল দিয়ে দিল।

নিষাদ পানির বোতল প্রায় শেষ করে ফেলল। পানি খেতে যে 'কোক-ফান্টা'র চেয়েও একশ' গুণ ভালো তা সে আগে বুঝতে পারে নি। পানির বোতল রাখতে রাখতে বলল, পিপি করব।

লোকটা বলল, গাছের আড়ালে করে ফেল। ঐ গাছটার পেছনে যাও। জারুল গাছ। পিপি করার জন্যে ভালো গাছ।

নিষাদ বলল, কমোডে পিপি করব।

'এখানে কমোড পাব কোথায় ?'

লোকটার কথা নিষাদের যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত মনে হল। সে বলল, প্যান্টের জিপার খুলে দাও।

ক্ষীরের

www.MurchOna.orgwww.MurchOna.org

নিষাদ অনেক বড় হয়েছে ঠিকই তারপরেও দু'টা কাজ নিজে নিজে করতে পারে না। সে নিজে নিজে জুতার ফিতা লাগাতে পারে না আর প্যান্টের জিপার খুলতে পারে না।

লোকটা প্যান্টের জিপার খুলে দিল। নিষাদ পিপি করে লোকটার পাশে বসতে বসতে বলল, তোমার নাম কি ? What is your name ?

লোকটা বলল, আমি ভোক্কস। ভোক্কসদের আলাদা নাম থাকে না। রাক্ষস-খোক্কসদেরও আলাদা নাম থাকে না। কেউ বলবে না করিম রাক্ষস। আবদুল রাক্ষস।

নিষাদ বলল, তোমার নাম সুন্দর আছে।

'ধন্যবাদ।'

নিষাদ বলল, আমার নাম নিষাদ। নিষাদ নামের অর্থ জানো ?

লোকটা বলল, জানি। প্রাচীন বন্যজাতি। ব্যাধ, চণ্ডাল। ধীবর। সংগীতে স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর 'নি'। স্ত্রী লিঙ্গ নিষাদী।

নিষাদ বলল, তুমি এত কথা বলছ কেন ?

'নিষাদ শব্দের মানে জানতে চেয়েছ বলে বললাম।'

'উত্তরায়ন শব্দের মানে জানো ?'

'জানি। সূর্যের উত্তরগতি, যে সময়ে সূর্যের পথ ক্রমশ উত্তর দিকে সরিতে থাকে (২২ ডিসেম্বর হইতে ২১ জুন। পঞ্জিকায় মাঘ হইতে আষাঢ়)।'

নিষাদ বলল, তুমি কিছুই জান না। উত্তরায়ন হল উত্তরের বাতাস।

একটানে এই পর্যন্ত লেখার পর মনে হল এই লেখা ছাপানো যাবে না। লেখাটা ঠিক হচ্ছে না।

তোমরা কি বলতে পারবে, কেন ঠিক হচ্ছে না। মনে হয় না বলতে পারবে। আমি ব্যাখ্যা করার পর পরই বলবে আসলেই তো তাই।

আচ্ছা এখন বলি— লেখকদের কিছু দায়িত্ব থাকে। বিশেষ করে শিশু পাঠকদের প্রতি দায়িত্ব। তারা মিসদের কথা (তাদের শিক্ষকদের কথা) এবং ছাপা অক্ষরে লেখার কথা খুব বিশ্বাস করে।

==========

আমার এই লেখা পড়ে কোনো বাচ্চা যদি মনে করে স্কুল থেকে বের হয়ে একা একা ঘুরে বেড়ানো তো খুব মজার ব্যাপার। এটা কি ঠিক হবে ? সব শহরেই নানান ধরনের দুষ্ট লোক আছে। স্কুল পালানো বাচ্চা যদি তার পাল্লায় পড়ে তখন কি হবে ? খারাপ কিছু ঘটে গেলে তার দায়িত্ব তো লেখককে নিতে হবে।

আমি যখন ছোট ছিলাম তখনকার একটা ঘটনা বলি। মাত্র পড়তে শিখেছি। ইংরেজি না বাংলা। আমাদের সময় ইংরেজি স্কুল ছিল না। সব বাংলা স্কুল। আমরা ইংরেজি শিখতাম উপরের ক্লাসে উঠে।

যে কথা বলছিলাম। ক্লাস থ্রি বা ফোরে পড়ার সময় হাতে একটা বই এল (নাম মনে পড়ছে না)। অ্যাডভেঞ্চারের বই। যেখানে একটা বাচ্চা ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। নানান অ্যাডভেঞ্চার করে আবার ফিরে আসে। অ্যাডভেঞ্চার শব্দের মানে কি বল তো ? মানে জান, কিন্তু বাংলাটা মাথায় আসছে না তাই না ? অ্যাডভেঞ্চার হল দুঃসাহসিক কাণ্ডকারখানা, দুঃসাহসিক অভিযান।

অল্প বয়সী ছেলেটির দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প পড়ে আমি অভিভূত হলাম। এবং মাথায় ঢুকল আমাকেও অভিযানে বের হতে হবে।

আমার মা তোষকের নিচে টাকা-পয়সা রাখতেন। সেখান থেকে ভাংতি পয়সা চুরি করলাম। তাঁর একটা মাটির ব্যাংক ছিল। সেটা ভেঙে পকেট ভর্তি ভাংতি পয়সা নিয়ে রিকশায় চড়ে গেলাম সিলেট রেল স্টেশনে।

দুপুরবেলা একটা ট্রেনে উঠে পড়লাম। ট্রেন যখন ছাড়ল তখন মনে হল সর্বনাশ! আমি কী করছি ? কোথায় যাচ্ছি ? আমি শুরু করলাম কান্না।

বাসায় কী করে ফিরলাম সেটা অন্য গল্প। আরেক দিন বলব।

এখন দেখ একটা বই আমাকে দিয়ে কি করিয়েছে। চুরি করতে শিখিয়েছে এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া শিখিয়েছে।

মানুষের জীবনে বইয়ের অনেক প্রভাব। শুধু মানুষ না, পুরো জাতি বদলে দিয়েছে এমন বইও কিন্তু আছে। কার্ল মার্ক্সের লেখা 'দ্য ক্যাপিটাল' এ রকম একটা বই।

দু'টা বই আমার নিজের জীবনটা বদলে দিয়েছিল। একটা পড়ি ক্লাস টু বা থ্রিতে পড়ার সময়। বইটার নাম 'ক্ষীরের পুতুল'। লেখকের নাম অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইয়ের ছেলে। তিনি অদ্ভুত সুন্দর

ছবি আঁকতেন। বিশেষ ধরনের ছবি, যার নাম ওরিয়েন্টাল পেইনটিং। দ্বিতীয় বইটি পড়ি যখন আমি ক্লাস ফাইভের ছাত্র। বইটির নাম 'পথের পাঁচালী' লেখকের নাম বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই বই দু'টি একজন মানুষের জীবন কীভাবে বদলে দেয় জানতে চাচ্ছ তো ? আরেক দিন বলব।

কী শিখলে ?

১. উত্তরায়ন কি ?
২. অ্যাডভেঞ্চার শব্দের মানে কি ?
৩. দ্য ক্যাপিটাল বইটি কার লেখা ?
৪. পথের পাঁচালী উপন্যাসের লেখকের নাম কি ?
৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কে হন ?
৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ধারার ছবি আঁকতেন তার নাম কি ?
৭. তোমার পড়া সবচেয়ে সুন্দর বইটির নাম কি ?

নতুন একটা দিন শুরু হচ্ছে। আমি দিন শুরুর প্রক্রিয়ায় আছি। পাঁচটা খবরের কাগজ নিয়ে বসেছি। সাধারণত সব বাড়িতে একটা বা দু'টা কাগজ রাখা হয়। আমি নিজে একটা কাগজই রাখি। লেখক হিসেবে সৌজন্য কপি বাকি চারটা পাই। আমার দিন শুরু হয় চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়া দিয়ে।

তোমরা এখনো মনে হয় খবরের কাগজ পড়া শুরু করনি। শুরু করার কথাও না। তোমাদের দিন শুরু হয় স্কুলে যাবার প্রস্তুতি দিয়ে। ব্যাগে বই খাতা নেয়া। পানির বোতল নেয়া। টিফিন নেয়া এইসব। তোমরা যখন স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হও তখন নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ তোমার বাবা খবরের কাগজ নিয়ে বসেছেন। হয়ত বলেছেন, পড়ার মতো কোনো খবরই নাই।

পড়ার মতো খবর একেক জনের কাছে একেক রকম। কেউ খেলার খবর পড়েন। আবার কেউ নায়ক-নায়িকা নিয়ে নানান কেচ্ছা-কাহিনীর বিনোদন পাতাটা আগে খুলেন। বিনোদন পাবার চেষ্টা করেন। খুন-খারাবির খবর পড়তেও অনেকে ভালবাসেন। আমেরিকায় একবার বিরাট জরিপ চালানো হয়েছিল। কোন ধরনের খবর পাঠক আগ্রহ নিয়ে পড়ে তা জানার জন্যে। তাদের ফলাফল খুবই আশ্চর্যজনক। শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ না-কি খুন জখম মারামারি কাটাকাটির খবর পড়তে ভালবাসে।

পৃথিবীর সব দেশের মানুষ একই রকম। গায়ের চামড়া শাদা হোক বা কালো হোক, মানসিকতায় বড় পরিবর্তন নেই। কাজেই ধরে নেয়া যায় আমাদের দেশেও একই অবস্থা। খুন-খারাবির খবরই আমাদের ৮০ ভাগ মানুষের পছন্দ।

আমি মনে হয় আশি ভাগ মানুষের মধ্যে পড়ি না। কারণ এই জাতীয় খবর আমার পড়তে একেবারেই ভালো লাগে না। ভয়ংকর ছবিগুলিও দেখি না। আমার আগ্রহ অদ্ভুত খবরের দিকে। মাঝে মাঝেই খবরের কাগজে

==========

অদ্ভুত খবর ছাপা হয়। এইসব খবর আমি শুধু যে আগ্রহ নিয়ে পড়ি তা-না, মাঝে মাঝে সরেজমিন নিজেই চলে যাই, খবরটা কতটুকু সত্যি তা জানার জন্যে। এখন অবশ্য নিজে যাই না। ক্যামেরা সঙ্গে দিয়ে লোক পাঠাই। তাদের দায়িত্ব ছবি তুলে নিয়ে আসা।

একবার খবর ছাপা হল অমুক জেলার অমুক গ্রামের একটা দিঘির পানি হঠাৎ করে সরবতের মতো মিষ্টি হয়ে গেছে। সবাই এই দিঘির পানি দিয়ে পায়েস রান্না করছে। সেই পায়েসে আলাদা চিনি দিতে হচ্ছে না। দিঘির পানি আবার বাত, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখের জন্যে মহৌষধ।

আমি খোঁজ নেয়ার জন্যে লোক পাঠালাম। জানা গেল সেই অঞ্চলের কেউ পুকুরের পানি মিষ্টি হয়ে যাবার খবর জানে না।

কিছুদিন পর পর একটি বিশেষ আবিষ্কারের খবর অতি গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়। আবিষ্কৃত যন্ত্র এবং আবিষ্কারকের গম্ভীর মুখের ছবি ছাপা হয়। তোমাদের জন্যে এ রকম খবর ছেপে দিচ্ছি।

তরুণ বিজ্ঞানীর অসাধারণ সাফল্য

জ্বালানি ছাড়াই বিদ্যুৎ

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

জামালপুর শহরের অষ্টম শ্রেণী পাস লেদকর্মী সুরুজ মিয়া জ্বালানি ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের কৌশল বের করেছেন। তার উদ্ভাবিত যন্ত্র অনেক বিশিষ্টজনরা দেখেছেন। স্থানীয় মহিলা কলেজের শিক্ষক আজিজুর রহমান খাঁ নিজস্ব প্রতিনিধিকে বলেছেন— "কোন রকম জ্বালানি ছাড়া মোটর চলছে তা আমি পরীক্ষা করেছি। এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার। সরকারের উচিত এই আবিষ্কারের ফল বাংলার জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া।"... ইত্যাদি।

তোমাদের বলছি শোন, জ্বলানি ছাড়া বিদ্যুৎ পদার্থবিদ্যার সূত্রকেই অস্বীকার করে।

'Perpetual motion machine' কখনোই সম্ভব না।

পার্পিচুয়েল মোশন মেশিন কি জানতে চাও ? এটা হচ্ছে সেই যন্ত্র যা আপনাআপনি চলে।

প্রাচীন গ্রীসের অনেক বিজ্ঞানী এ ধরনের যন্ত্র আবিষ্কারের কথা ভেবেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আছেন দার্শনিক ও বিজ্ঞানী এরিস্টটল।

বুঝতেই পারছ এই ধরনের খবর ছাপা হলে আমার বেশ মন খারাপ হয়। জিন-ভূতের খবর দেখলেও মন খারাপ হয়। যখন মানুষ চাঁদে চলে গেছে। মঙ্গল গ্রহে যাবার প্রস্তুতি চলছে। তখন খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে এতিমখানার সাতজন বালিকার উপর জিনের আছর। কোনো মানে হয় ?

আজ খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে মন খারাপ করার মতো একটা খবর পড়লাম। সাত বছর বয়েসী এক শিশু পীর হয়ে গেছে। সে সবাইকে পানিপড়া দিচ্ছে। এই পানিপড়া খেয়ে জটিল ব্যাধির আরাম হচ্ছে। শত শত মানুষ পানিপড়া নিতে আসছে। শান্তি রক্ষার জন্যে প্রশাসন সেখানে অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি করেছে। কয়েকটা ভাতের হোটেল খোলা হয়েছে। হোটেলগুলির রমরমা ব্যবসা। শিশুপীরের পানিপড়া বোতলজাত করার দায়িত্ব নিয়েছে একটা কোম্পানি। পানির নাম— Abdul's holy water. আব্দুলের পবিত্র পানি। শিশুপীরের নাম আব্দুল মিয়া।

মন খারাপ হলে তোমরা কী কর ? কাঁদো ? আমি কি করি বলি— মুখ ভোতা করে লেখার টেবিলের কাছে যাই। কাগজ কলম হাতে নিয়ে বসি। আজও তাই করেছি। হঠাৎ শুনি নিষাদের চিৎকার— 'ভোক্কস মামার ছবি। ভোক্কস মামার ছবি।'

তাকিয়ে দেখি একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সে ছোটাছুটি করছে এবং চেঁচাচ্ছে। তার হাত থেকে কাগজটা নিলাম। সেখানে সত্যি সত্যি ভোক্কসের ছবি। ছবির ক্যাপশন 'ছিনতাইকারী ধৃত। গণপিটুনিতে আহত। অবস্থা আশংকাজনক। বর্তমানে মিটফোর্ড কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।'

এতক্ষণ ছিল মন খারাপ। এখন হল মেজাজ খারাপ। ভোক্কস ছিনতাইকারী এটা বিশ্বাস্য নয়। আবার পুরোপুরি অবিশ্বাস্যও নয়। মানুষ খুবই অদ্ভুত জীব। মানুষের বিষয়ে আগেভাগে কিছু কখনোই বলা যাবে না।

ঘটনা কি জানার জন্যে আমি বাংলাবাজারের প্রকাশক সোবাহান সাহেবকে টেলিফোন করলাম। আমাদের মধ্যে এই কথাগুলি হল।

'সোবাহান সাহেব আজকের কাগজ পড়েছেন ?'

'জী জনাব।'

'ভোক্কসের নিউজ পড়েছেন ?'

'জী।'

'ঘটনা কি বলুন তো।'

'ঘটনা সত্যি।'

'বলেন কি?'

সোবাহান সাহেব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ঘটনা শুনে আমিও আপনার মতো মন খারাপ করেছি। সকালে নাস্তা খাওয়ার মতো রুচিও হয় নাই।

আমি বললাম, সে কি আসলেই ছিনতাই করেছে?

'হ্যাঁ করেছে। এক ভদ্রলোক ব্রিফকেস হাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ভোক্কস ছুটে এসে ব্রিফকেস নিয়ে দৌড় দিয়েছে। পাবলিক তখন ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলেছে। মেরেই ফেলছিল।'

'আপনি কি তাকে দেখতে গিয়েছিলেন?'

'না। ইচ্ছা হয় নাই।'

টেলিফোন রেখে আমি ঝিম ধরে বসে থাকলাম। শাওন বলল, তোমার পরিচিত একজন ছিনতাই করে ধরা পড়েছে। তাতে তুমি এত আপসেট কেন? তুমি তো ছিনতাই করনি।

আমি বললাম, ভোক্কস ছিনতাই করেছে এই বিষয়টা আমি নিতেই পারছি না।

শাওন বলল, তোমার দু'জন বন্ধু আছে যারা ব্যাংক থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়েছে। ফেরত দিচ্ছে না। ঋণখেলাপি হয়েছে। তারা তো ভোক্কসের চেয়েও বড় ছিনতাইকারী। তাদের কর্মকাণ্ডে তো তোমাকে এরকম মন খারাপ করতে দেখি না।

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, কথা ভুল বলনি। আমার এতটা মন খারাপ করা উচিত না। কেন জানি মনে হচ্ছে ঘটনায় কিছু ভুলভ্রান্তি আছে। ছিনতাই ভোক্কস করেনি। তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

শাওন বলল, এক কাজ কর। ভোক্কস তো হাসপাতালেই আছে। তার সঙ্গে দেখা করে জেনে নাও।

আমি বললাম, না।

না বলার পরও আমি বিকেলে মিটফোর্ড হাসপাতালে উপস্থিত হলাম।

ভোক্কসের অবস্থা দেখলাম শোচনীয়। সারা গায়ে ব্যান্ডেজ। নাক দিয়ে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। তাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে হাসপাতালের বিছানার সঙ্গে

বেঁধে রাখা হয়েছে। পাশে দু'জন পুলিশ। আমি পুলিশকে বললাম, ভাই এই মানুষটা আমার পরিচিত। আমি কি তার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি।

পুলিশ বলল, কি কথা বলবেন ? এই বদমাইশের কথা বলার অবস্থা নাই। তারপরেও দেখেন চেষ্টা করে।

আমি ভোক্কসের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ভোক্কস বিড়বিড় করে বলল, নিষাদ কেমন আছে ?

আমি বললাম, ভালো। সে পত্রিকায় ছাপা হওয়া আপনার ছবি নিয়ে ঘুরছে। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, 'আমার ভোক্কস মামা। আমার ভোক্কস মামা।'

ভোক্কস হেসে ফেলল। এই হাসি আনন্দের হাসি না-কি বেদনার হাসি কে জানে। আমাদের মস্তিষ্কে আনন্দ-বেদনার রসায়ন একই। আনন্দে মানুষ হাসে। আবার আনন্দে মানুষ কাঁদে।

আমি বললাম, ভাই ভোক্কস সত্যি করে বলুন তো আপনি কি ছিনতাই করেছেন ? ব্রিফকেস নিয়ে দৌড় দিয়েছেন ?

ভোক্কস স্পষ্ট গলায় বলল, হ্যাঁ।

আমি বললাম, ছিনতাই কি এই প্রথম করেছেন, না-কি আগেও করেছেন ?

ভোক্কস বলল, আগে দু'বার করেছি। তখন ধরা পড়ি নাই। এইবারও ধরা পড়তাম না। উল্টাদিকে দৌড় দিয়ে গলিতে ঢুকে পড়া উচিত ছিল।

ভোক্কসের সঙ্গে আর কথা বলা অর্থহীন। আমি চলে এলাম।

ছিনতাইয়ের মামলায় ভোক্কসের দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল।

কী শিখলে ?

১. ঋণখেলাপি কি ?
২. আপনাআপনি চলে এমন যন্ত্র কেন আবিষ্কার করা যাবে না ?
৩. দুঃখের কোন ঘটনা ঘটলে মানুষ কাঁদে আবার বিরাট আনন্দের ঘটনা ঘটলেও কাঁদে। কেন ?
৪. বেশির ভাগ মানুষ কোন ধরনের খবর পত্রিকায় পড়তে পছন্দ করে ?
৫. Perpetual motion machine কি ?
৬. এরিস্টটল কে ?

নিষাদ স্কুলে যায় লিখেছিলাম না ? সেটা ছিল বানানো গল্প। এখন সে সত্যি সত্যি স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। স্কুল তার ছোট্ট জীবনটা অনেকখানি বদলে দিয়েছে। স্কুলের গল্প করায় তার বিপুল আগ্রহ। তার টিচাররা কি বলেছেন তা নিয়েও তার উত্তেজনার শেষ নেই।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে গম্ভীর মুখে বলল, বাবা! জীবাণু কি জান ?

আমি বললাম, তুমি কি জান সেটা শুনি।

'ছোট ছোট পোকা।'

'ও আচ্ছা।'

'এত ছোট যে চোখে দেখা যায় না।'

'বল কি ?'

'এরা হাতের আঙ্গুলে বসে থাকে। এইজন্যে ভাত খাবার সময় হাত ধুতে হয়। হাত ধুলে পোকা চলে যায়। আমাদের মিস বলেছেন।'

আরেকদিন বলল, বাবা। আমাদের চারদিকেই জীবাণু। এরা ভয়ংকর। আমাদের মিস বলেছেন। খালি পায়ে হাঁটা নিষেধ। খালি পায়ে হাঁটলে পায়ের ভেতর দিয়ে জীবাণু ঢুকে পড়বে। তখন অসুখ হবে। আমি মরে যাব।

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললাম, জীবাণু নিয়ে নিষাদদের মিস একটু বাড়াবাড়ি করছেন বলে মনে হচ্ছে। ছোট্ট শিশুর ভেতর ভয় ঢুকিয়ে দেয়াটা ঠিক হচ্ছে না।

আমাদের চারদিকে জীবাণু কিলবিল করছে তা ঠিক। জীবাণুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতাও আমাদের শরীরের আছে। তাছাড়া সব জীবাণু ক্ষতিকর না। অনেক উপকারী জীবাণু আমাদের শরীরের ভেতরই বাস করে।

কিছু কিছু জীবাণু আমরা আগ্রহ করে খাই, এটা কি জান ? দৈ খেয়েছ না ? দৈ এর ভেতর কিলবিল করছে জীবাণু। জীবাণুরাই দুধকে বদলে দৈ বানিয়ে দিচ্ছে। পনীরও একই জিনিস।

==========

নিষাদের স্কুলের মিস্ কিছু অর্ধ সত্য শেখাচ্ছেন তাতে আমি মোটেই গুরুত্ব দিলাম না। একটা শিশু ভুল শুদ্ধ শিখতে শিখতেই বড় হবে। এক সময় সে নিজেই ভুল শুদ্ধ আলাদা করবে। এটিও শিক্ষারই অংশ।

আমি প্রতিদিন আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করি কখন স্কুল থেকে নিষাদ আসবে। হাত নেড়ে গম্ভীর মুখে নতুন কি শিখল তা বলবে।

একদিন সে খুবই উত্তেজিত অবস্থায় ফিরল। দৌড়ে এসে আমার কোলে বসতে বসতে বলল, বাবা! আজ একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে। [ভয়ংকর শব্দটা সে নতুন শিখেছে। কথায় কথায় 'ভয়ংকর' বলছে।]

আমি বললাম, কি ঘটেছে বাবা ?

'আমাদের মিসকে এক চিন্তাকারী ধরেছে। মিস খুব ভয় পেয়েছে।'

'চিন্তাকারী কি বুঝতে পারছি না তো।'

নিষাদ চোখ বড় বড় করে বলল, চিন্তাকারী খুব ভয়ংকর। চিন্তাকারী মিসের ব্যাগ নিয়ে গেছে।

এখন বুঝলাম চিন্তাকারী হল ছিনতাইকারী। আমার মজাই লাগল। শিশুর কাছে ছিনতাইকারী হয়ে গেল চিন্তাকারী। একজন সত্যিকার ছিনতাইকারী যদি শুনে একটা শিশু তাকে বলছে চিন্তাকারী তাহলে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও কি সে হতচকিয়ে যাবে না ? লজ্জাবোধ নামক মানবিক আবেগের মুখোমুখি হবার তো কথা।

অনেকদিন পর আমার ভোক্কসের কথা মনে হল। সে নিশ্চয়ই এখনো জেলে আছে। আমি ঠিক করলাম জেল থেকে বের হয়ে সে যদি এ বাসায় আসে তাহলে 'চিন্তাকারী' বিষয়টা তাকে বলব।

যখন এরকম ভাবছি তখনই কাকতালীয় একটা ব্যাপার ঘটল। প্রকাশক সোবাহান সাহেব আমাকে টেলিফোন করে বললেন, ভোক্কস কি আপনার সঙ্গে দেখা করেছে ?

আমি বললাম, সে তো জেলে।

সোবাহান সাহেব বললেন, সে গত মঙ্গলবারে ছাড়া পেয়েছে। জেলের বছর বারো মাসে হয় না। আট মাসে হয়।* যাই হোক সে জেল থেকে বের হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেনি। একা একা কোথায় ঘুরছে কে জানে।

---

* জেলের বছর আট মাসে হয় ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। জেলের প্রধানকে বলে জেলার। তিনি ইচ্ছা করলে কয়েদীদের সাজা ২৫% মওকুফ করতে পারেন। কয়েদীরা ভদ্রভাবে চললে, জেলের নিয়ম-কানুন না ভাঙলে এই সুবিধা পায়। কাজেই সাজা কমে যায়। বার মাসের সাজা আট মাসেই শেষ।

আপনার সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলবেন যে যা ঘটেছে ঘটেছে। তার জন্যে শাস্তিও পেয়েছে। তাকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। ইচ্ছা করলে সে আগের মতো আমার এখানে থাকতে পারে।

আমি বললাম, তার সঙ্গে দেখা হলে অবশ্যই বলব।

এখন তোমাদের কাকতালীয় বলে যে শব্দটা উচ্চারণ ব্যবহার করেছি সে সম্পর্কে বলি। নিষাদ যখন চিন্তাকারীর গলা বলছে ঠিক তখনই সাহেবের ছিনতাইকারী বিষয়ে টেলিফোন এল। একেই বলে 'কাকতালীয়' ঘটনা। একটা তালগাছে কাক বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা পাকা তাল গাছ থেকে মাটিতে পড়েছে। দু'টি ঘটনার ভেতর কোনো সম্পর্ক নেই। দুটিই আলাদা ঘটনা, ঘটেছে একসঙ্গে।

নিষাদ যদি চিন্তাকারীর গলা না বলত সোলেখান সাহেবের টেলিফোন কিন্তু আসত।

ভোক্কস জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমার সঙ্গে দেখা না করায় আমি খুশিই হলাম। দুষ্টু লোকজনদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়। দুষ্টু লোক গায়ে পড়ে যখন ঝামেলা করতে আসে তখন হয় সমস্যা।

যাই হোক, মূল গল্পে যাই। কয়েকদিন দুপুরে খেতে গেলাম। স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করলাম ভোক্কস তার পছন্দের বোতল বলে নেই। মনে হয় জেল থেকে ছাড়া পাবার পর তার জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

এর মধ্যে বাসায় ছোট্ট সমস্যা হল। নিষাদ এক রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠল। সে স্বপ্নে দেখেছে ভোক্কস একটা চটের খালি বস্তা নিয়ে নিষাদের স্কুলে গিয়েছে। নিষাদ স্কুল থেকে বের হওয়ামাত্র সে তাকে ডেকেছে – নিষাদ মামা ভালো।

নিষাদ তার কাছে ছুটে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভোক্কস নিষাদকে চালের বস্তায় ভরে বস্তার মুখ শক্ত করে বন্ধ করে দিয়েছে। নিষাদ চিৎকার করছে, আমি মা'র কাছে যাব। আমি মা'র কাছে যাব।

ভোক্কস তার চিৎকারে মোটেই কান দিল না। বস্তা পিঠে নিয়ে হাঁটা শুরু করল।

স্বপ্নটা ভয়াবহ। কিন্তু এই স্বপ্ন দেখে কেঁদে-কেটে অস্থির হওয়ার কিছু নেই। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আমি বললাম, স্বপ্ন হচ্ছে স্বপ্ন। এর বেশি কিছু না। তুমি নিষাদকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কর বলেই এ ধরনের স্বপ্ন দেখেছ।

শাওন বলল, ভোক্কসকে কেন দেখলাম ?

আমি বললাম, তাকে নিয়ে তোমার সন্দেহ আছে। কাজেই স্বপ্নে সেও উপস্থিত হয়েছে।

শাওন বলল, এ রকম কিছু ঘটবে বলেই আমি স্বপ্নে ইশারা পেয়েছি। আমি ছেলেকে স্কুলেই পাঠাব না।

'সে পড়াশোনা করবে না ?'

'তার পড়াশোনার কোনো দরকার নেই।'

বাচ্চাদের প্রতি মায়েদের যে ভালোবাসা কাজ করে তার নাম— অন্ধ ভালোবাসা। এই অন্ধ ভালোবাসা মাঝে মাঝে বাচ্চাদের কিছু ক্ষতিও করে। যেমন নিষাদের স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। সে মহানন্দে গাড়িতে চড়ে ঘুরে। তার গাড়ির হর্ন নষ্ট হয়ে গেছে বলে সে এখন হর্ন দিতে পারছে না। তাতে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সে মুখে হর্ন দিচ্ছে। বিকট চিৎকার করে বলছে পিঁ পিঁ পিঁ। কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়।

নিষাদকে ঘরে বন্দি করেই তার মা থেমে যায়নি। নিষাদের স্কুলে গিয়ে প্রিন্সিপ্যালকে ভোক্কসের কথা বলে এসেছে। ভোক্কস নামে কেউ নিষাদের খোঁজ করলে সঙ্গে সঙ্গে বাসায় জানাতে হবে। বাসার দারোয়ানদেরও বলা হয়েছে। ভোক্কসের বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধ।

এক সপ্তাহ পার হল। নিষাদ আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করল। সব স্বাভাবিক। সমস্যা হল আমার। কারণ নিষাদকে স্কুলে আনা-নেয়ার দায়িত্ব পড়ল আমার কাঁধে। আমি অনেক রাত জেগে লেখালেখি করি। সকালে ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হয়।

স্কুল থেকে তাকে আনার যন্ত্রণাও অনেক। স্কুলের সামনে যেসব খাবার দাবার বিক্রি হয়, সবই তাকে কিনে দিতে হবে। আচার, জলপাই ভর্তা, কুলপি বরফ সব লাগবে। অনেকবার বলেছি, বাবা, মানিব্যাগ আনতে ভুলে গেছি। সঙ্গে টাকা নেই। তখন ফেরিওয়ালারা হাসিমুখে বলে, স্যার বাকি নিয়া যান। টেকা পরে দিবেন।

আমি রোজ নিষাদকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছি আসছি এবং প্রতিদিনই অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়াচ্ছি। আমার সময় খুব যে খারাপ কাটছে তাও না। বাসায় ফেরার পথে নিষাদ হাত নাচিয়ে গল্প করে। সে এখন গল্প বানাতে শিখেছে। সবই ভূত বা রাক্ষসের গল্প। তার একটা গল্পের নমুনা দেই।

'বাবা! আজ স্কুলে কি হয়েছে জান ?'

'জানিনা তো।'

'স্কুলে একটা ভূত এসেছিল।'

'কি সর্বনাশ!'

'ভয়ংকর ভূত।'

'ভূতটা কি করল ?'

'আমাদের খেয়ে ফেলল।'

'কি সর্বনাশ! সবাইকে খেয়ে ফেলল ?'

'হুঁ। আমাদের মিসকেও খেয়ে ফেলল।'

'তারপর ভূতটা কি করল ?'

'আমাদের চেয়ার টেবিলগুলিও খেয়ে ফেলল।'

'বলো কি ?'

'আমরা যে ছবি এঁকেছি, সেগুলিও খেয়ে ফেলল।'

একটি বাচ্চা ছেলের মুখে অদ্ভুত সব কথা শুনতে আমার কি যে ভালো লাগে। যখন তাকে আনতে যাই মনে মনে ভাবি আজ না জানি কি গল্প শুনব।

এক বুধবারের কথা। তাকে আনতে গিয়ে দেখি— স্কুল মাঠ খালি। কোনো বাচ্চাকাচ্চা নাই। দারোয়ান স্কুল মাঠে বসে পান চিবাচ্ছে।

দারোয়ান আমাকে বলল, আপনার ছেলে তো চলে গেছে।

আমি বললাম, চলে গেছে মানে। কখন গেছে ? কার সঙ্গে গেছে ?

দারোয়ান বলল, আজ হাফ স্কুল। এগারোটার সময় গেছে। কার সঙ্গে গেছে বলতে পারব না।

স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের কাছে গেলাম। তিনি বললেন— আজ হাফস্কুল সেটা আগেই বলা হয়েছে। সব ছাত্রছাত্রীর খাতায় লিখেও দেয়া হয়েছে। আপনারা খাতা পড়েন না ? কেমন গার্জিয়ান বলুন তো।

বাংলা প্রবচন আছে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া। আমার মাথায় আকাশ না সৌরমণ্ডলের সবচে বড় গ্রহ বৃহস্পতি ভেঙে পড়ল। আমি দ্রুত চিন্তা করলাম নিষাদ কোথায় যেতে পারে। সম্ভাবনা কি ?

সম্ভাবনা ১.

সে স্কুলেই আছে। বাথরুমে আটকা পড়েছে। কিংবা ছাদে।

সম্ভাবনা ২.

সে একা একা রওনা হয়েছে। এখন পথে পথে হাঁটছে।

==========

সম্ভাবনা ৩.

সে তার কোন এক বন্ধুর বাবা-মা'র সঙ্গে গেছে। তারা তাকে বাসায় নামিয়ে দেবে।

সম্ভাবনা ৪.

তাকে কোনো দুষ্ট লোক নিয়ে গেছে।

চতুর্থ সম্ভাবনাটা ভয়াবহ। কোনো শিশু হারিয়ে গেলে তাদের বাবা-মা'র মাথায় এই সম্ভাবনাই প্রথম আসে। বাংলাদেশের অনেক শিশু বাইরে পাচার হয়। পাচারের মূল পথ নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু। এদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান তাদের স্থান হয় নিঃসন্তান দম্পতির কাছে।

যারা কম ভাগ্যবান তারা উটের জকি হয়। মরুভূমিতে উটের দৌড়ে তাদের ব্যবহার করা হয়।

অনেকে বিক্রি হয় দাস বা দাসী হিসেবে। তোমরা শুনলে অবাক হবে, অতি সুসভ্য পৃথিবীতে এখনো গোপনে দাসপ্রথা চালু আছে।

মুক্তিপণের কথা কি জান ? ভয়ংকর মানসিকতার কিছু মানুষ শিশুদের আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবি করে। টেলিফোন করে বলে অমুক জায়গায় এত টাকা নিয়ে যেতে হবে। পুলিশকে কিছু জানানো যাবে না। জানালে...

বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলা হয়। বেশির ভাগ মানুষ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে না। আমি পারি। কেন জান ? আমি পারি কারণ আমি আমার জীবনে বেশ কয়েকবার মহাবিপদে পড়েছিলাম। বিপদ থেকে শিক্ষা নিয়েছি।

নিষাদকে পাওয়া যাচ্ছে না এই খবরটা আমি শুধু দু'জনকে জানালাম। তার মা'কে এবং নিষাদের দাদী অর্থাৎ আমার মা'কে। তাদেরকে কঠিনভাবে বললাম, আর কেউ যেন না জানে। জানলেই দুনিয়ার আত্মীয়-স্বজন ভিড় করবে। সারাক্ষণ টেলিফোন করে করে আমাদের টেলিফোন লাইন ব্যস্ত করে রাখবে। এখন টেলিফোন লাইন খোলা থাকা খুব জরুরি।

তারপরেই খবর দিলাম পুলিশকে। বর্তমান পুলিশ বাহিনীর হাতে অনেক আধুনিক ব্যবস্থা আছে। তারা টেলিফোনের কথা-বার্তা ট্র্যাকিং করে অপরাধীকে অতি অল্প সময়ে ঘেরাও করে ফেলতে পারে।

চব্বিশ ঘণ্টা পার না হলে পুলিশ কাউকে নিখোঁজ ঘোষণা দেয় না। এমনও তো হতে পারে কাউকে কিছু না জানিয়ে একজন গেছে তার বন্ধুর বাসায়। রাত হয়েছে বলে থেকে গেছে। তাকে নিখোঁজ ঘোষণা করা

অর্থহীন। শিশুদের বেলা এই নিয়ম প্রযোজ্য না। একটি শিশুর কোনো খোঁজ এক ঘণ্টার মধ্যে পাওয়া না গেলেও পুলিশ তার সন্ধানে নেমে পড়বে।

থানার ওসি সাহেব আমাকে বললেন— পুলিশের কয়েকটা বিভাগ মাঠে নেমে পড়েছে। এদের মধ্যে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ আছে, CID আছে, র‍্যাব আছে। আপনি অস্থির না হয়ে বাসায় যান টেলিফোনের সামনে বসে থাকুন। আপনার ছেলে যার কাছে আছে সে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

আমি বাসায় ফিরলাম। বাসার অবস্থা ভয়াবহ। শাওন ঘন ঘন ফিট হচ্ছে। আমার মা জায়নামাজে বসে নামাজ পড়ছেন। আমার মা'র ধারণা যে কোনো সমস্যা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় প্রার্থনা।

আমার কথা হল প্রার্থনা অবশ্যই করতে হবে। পরম করুণাময়ের করুণা ভিক্ষা করতে হবে এবং একই সঙ্গে বিপদ মুক্তির অন্যসব চেষ্টাও চালাতে হবে। নবীজির একটি বাণী, 'তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে এসে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখ, কিন্তু— উটটাকে বেঁধে রাখতে ভুলে যাবে না।' এর অর্থ হল আল্লাহর ওপর ভরসা করে উটটাকে ছেড়ে দিলে সে মরুভূমিতে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে যেতে পারে।

ঘরে চুপচাপ বসে থাকা আমার জন্যে অসম্ভব মনে হল। আমি রাস্তায় বের হলাম। অদ্ভুত সব চিন্তা মাথায় আসছে। বারবার মনে হচ্ছে এই বুঝি পেছন থেকে নিষাদের গলা শুনব। নিষাদ মিষ্টি গলায় ডাকবে— বাবা! কোথায় যাচ্ছ ? আমাকে আইসক্রিম কিনে দাও।

নিষাদের স্কুলে গেলাম। একবার স্কুল দেখা হয়েছে। আবার দেখা হল। প্রতিটি বাথরুম দেখলাম। ছাদে গেলাম। একবার মনে হল ভোক্কস তাকে নিয়ে যায়নি তো ? যে বেঞ্চে ভোক্কস বসে থাকত অনেকদিন পর তাকে সেখানে বসে থাকতে দেখলাম। তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হল না। আমার মনের যে অবস্থা তাতে সামাজিক সৌজন্য কথাবার্তার ব্যাপারটা আসে না। তবে চায়ের দোকানদারের কাছে খোঁজ নিলাম। সে বলল, ভোরবেলা থেকে এই লোক বসে আছে। গতকালও বসে ছিল। আমি বললাম, কত ভোরে এসেছে ? চায়ের দোকানি বলল। আমি দোকান খুলতে আইসা দেখি এ বসা।

ভোক্কস নিষাদকে নিয়ে যায়নি। এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে আবারও থানায় গেলাম।

ওসি সাহেব বললেন, রেল স্টেশন, বিমান বন্দর, লঞ্চঘাট সব জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আপনার ছেলের ছবি প্রতিটি থানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

==========

আমি বললাম, আপনারা তার ছবি কোথায় পেলেন ? ওসি সাহেব বললেন, আপনার বাসায় গিয়েছিলাম। আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে জোগাড় করেছি।

আমি বাসায় ফিরলাম। আমার মা'কে জায়নামাজে পাওয়া গেল। শাওনকে পাওয়া গেল না। তার শরীর এতটাই খারাপ করেছে যে তাকে ল্যাবএইড নামের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাকে মর্ফিন ইনজেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

তাকে হাসপাতালে দেখতে গেলাম। মনে হল একটা মৃত মানুষ শুয়ে আছে। রক্তশূন্য সাদা মুখ। চোখ ডেবে গেছে। মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। শাওনের পাশে তার বাবা-মা আছেন। তার মা মেয়ের মতো ঘন ঘন ফিট হচ্ছেন। যখনই জ্ঞান আসছে তখনি বলছেন, 'আমার নান্নানজি কোথায় গেল ? আমার নান্নানজি!' নিষাদ তাঁকে নান্নানজি ডাকে। তিনিও নিষাদকে নান্নানজি ডাকেন।

নিষাদের নানা মানসিকভাবে যথেষ্টই সবল মানুষ। তিনি ভেঙে পড়েননি। তিনি আমাকে জানালেন, নিষাদকে যে খুঁজে বের করবে বা তার সম্পর্কে তথ্য দেবে তিনি তাকে বড় অংকের টাকা পুরস্কার হিসেবে দেবেন। পুরস্কারের বিষয়টা থানায় এবং টিভি চ্যানেলগুলিতে জানানো হয়েছে। রাত আটটার খবরের পর থেকে প্রচার শুরু হবে।

আমি বললাম, পুরস্কার ঘোষণা করা ঠিক হবে না। অপহরণকারীদের এতে উৎসাহ দেয়া হবে।

তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, মহারাজের জন্যে যা করতে আমার মন চায় আমি তাই করব। তুমি তোমার মতো চেষ্টা কর। আমি আমার মতো করব।

নিষাদের নানা নিষাদকে মহারাজ ডাকেন। নিষাদও তাকে ডাকে মহারাজ।

আমি তাদের হাসপাতালে রেখে আবার রাস্তায় নামলাম। কোথাও এক দণ্ড স্থির হয়ে থাকতে পারছি না। আমার অস্থিরতা কোন পর্যায়ের তা তোমাদের বুঝাতে পারব না। বোঝার প্রয়োজনও নেই।

সন্ধ্যা পার হয়েছে। রাস্তায় হলুদ বাতি জ্বলছে। আকাশে ঘন মেঘ। এক সময় মুষল ধারে বৃষ্টি শুরু হল। আমার কাছে মনে হল আমার ছোট্ট বাবার শোকে আকাশ কাঁদতে শুরু করেছে।

==========

আমি ঘরে ঢুকলাম না। বারান্দার মেঝেতে পা ছড়িয়ে বৃষ্টি দেখছি। বাসা ভর্তি মানুষ। এর মধ্যে খবর ছড়িয়ে গেছে। সবাই ছুটে এসেছে। ঘরের ভেতর এত মানুষ। সবাই চুপচাপ। বাড়ির ভেতরে কবরের নৈঃশব্দ। শুধু নিষাদের চাচীর কান্নার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নিষাদের এই চাচী হলেন অবসর প্রকাশনার আলমগীর রহমান সাহেবের স্ত্রী। নিষাদকে দিনে একবার দেখতে না পেলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। নিষাদের জন্যে এতই তাঁর মায়া।

আমার পাশের ফ্ল্যাটে থাকে অন্যদিন পত্রিকার সম্পাদক মাজহার। সে তার অফিসের সব কর্মচারীকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে। একেক জন একেক দিকে গেছে নিষাদের সন্ধানে। মাজহার, ইম্পেরিয়েল কলেজ নামে একটা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। সেই কলেজের সব ছাত্রছাত্রী রাস্তায় নেমেছে। আমার মনে হচ্ছে আমি একা না। অনেকেই আছে আমার সঙ্গে।

মাজহারদের ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজা থেকে মাজহারের স্ত্রী স্বর্ণার ফুঁপিয়ে কাঁদার শব্দ পাচ্ছি। স্বর্ণার দুই ছেলে অমিয় এবং অন্বয় মাকে জড়িয়ে ধরে আছে। এরা দু'জন নিষাদের খেলার সাথী। আজ তাদের খেলা বন্ধ। খেলার সাথী নেই।

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। আমি টেলিফোন কানে দিতেই শুনলাম নিষাদ বলল, বাবা! তুমি কি কর ?

আমি প্রচণ্ড ধাক্কা সামলে নিয়ে বললাম, তুমি কি কর ?

নিষাদ বলল, দৈ খাই।

'দৈ কে কিনে দিয়েছে ?'

'ভোক্কস মামা!'

'বাবা! ভোক্কস মামাকে একটু দাও। কথা বলব।'

'না দিব না। আমি কথা বলব।'

'আচ্ছা কথা বল।'

'বাবা তোমার আর মা'র জন্যে আমি দৈ কিনেছি।'

'খুব ভাল করেছ।'

'দৈটার নাম শক্তি দৈ। এটা খেলে শক্তি হয়।'

'তুমি কোথায় আছ এইটা কি আমাকে বলবে ?'

'বলব।'

'তাহলে বল।'

'আমি এখন লিফটের ভেতর।'

==========

'লিফটা কোথায় ?'

'আমাদের বাসার লিফট।'

নিষাদের কথা শেষ হবার আগেই লিফটের দরজা খুলল। দেখি নিষাদকে নিয়ে ভোক্কস দাঁড়িয়ে আছে। নিষাদের এক হাতে বেলুন। অন্য হাতে দু'টা নীল রঙের শক্তি দৈ।

তাকে দেখে কি আনন্দ বাসায় হল তা না বলে দু'টা ঘটনা বলি। মাজহারের দুই পুত্র অমিয়, অন্বয় বিকট চিৎকার করে খাট থেকে লাফ দিল। অন্বয়ের পা ভেঙে গেল। তাকে নিয়ে তার বাবা-মা ছুটল হাসপাতালে।

আমার মা এতক্ষণ স্বাভাবিক ছিলেন। নিষাদকে দেখার পর তাঁর মাইল্ড স্ট্রক হল। তিনি জায়নামাজে মাথা এলিয়ে পড়ে গেলেন। আরেকজন তাঁকে নিয়ে ছুটল হাসপাতালে। এতসব ঘটনা ঘটছে কিন্তু নিষাদ নির্বিকার। সে তার গাড়িতে উঠে পিঁ পিঁ শব্দ করে গাড়ি চালাচ্ছে।

ভোক্কস তাকে কোথায় পেয়েছে। কি ঘটনা তা জানার সময় আমার নেই। আমি নিষাদকে নিয়ে ছুটে গেলাম ল্যাবএইড হাসপাতালে। তাকে তার মা'র বিছানার পাশে বসিয়ে দেয়া অত্যন্ত জরুরি।

হাসপাতালে পৌঁছেই শুনলাম আমার ধানমন্ডির বাসায় পুলিশ এসেছে। পুলিশ শিশু অপহরণের দায়ে ভোক্কসকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

প্রশ্নমালা

১. সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহটার নাম কি ?
২. জীবাণু কি ?
৩. জেলের বছর আট মাসে হয় কেন ?
৪. কাকতালীয় ব্যাপারটা কি ?
৫. নবীজির (স.) উট বিষয়ক হাদিসটা বল।
৬. অন্ধ-ভালোবাসার একটি উদাহরণ দাও।

নিষাদ প্রত্যাবর্তন দিবসের আজ দ্বিতীয় দিন। বাসার পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এরিখ মেরিয়া রেমার্কের মতো বলা যায় 'পশ্চিম রণাঙ্গন শান্ত'। এরিখ মেরিয়া রেমার্ক হলেন জার্মানির একজন ঔপন্যাসিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির বর্ণনা তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসে এভাবেই দিয়েছিলেন। আমার ফ্ল্যাটটাও যুদ্ধের পরের অবস্থায়। যেদিকে তাকাই শান্তি শান্তি লাগে। নিষাদের চিৎকারেও কানে মধুবর্ষণ করে। আমার ইচ্ছা করছে তাকে একটা মাইক কিনে দিতে। যাতে সে মাইকে চিৎকার করে আশেপাশের সবার মাথা খারাপ করে দেয়।

একটাই সমস্যা ঐ দিন কি ঘটেছিল সে বিষয়ে কিছুই জানতে পারছি না। নিষাদকে অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি সে তার স্বভাবমতো কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়েই গল্প বানাতে শুরু করে। উদাহরণ—

বাবা নিষাদ! ঐ দিন আমি তোমাকে স্কুল থেকে আনতে যাই নি। তুমি কি করেছিলে ?

'আমি একা গেট থেকে বের হলাম।'

'দারোয়ান কিছু বলল না ?'

'দারোয়ান যখন ছিল না তখন বের হয়েছি।'

'তারপর কি করলে ?'

'তখন একটা লোক আমাকে আইসক্রিম কিনে দিল।'

'তারপর কি হল ?'

'লোকটা তখন একটা ভূত হয়ে গেল। আইসক্রিমওয়ালাকে খেয়ে ফেলল।'

'আচ্ছা।'

'তারপর কি হয়েছে শোন বাবা। সে আমাকেও খেয়ে ফেলল। একটা রিকশা খেয়ে ফেলল।'

'ভূত হবার আগে লোকটা কেমন ছিল ?'

নিষাদ এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভূতটা কি কি খেয়েছে তার বর্ণনা শুরু করল। রিকশা খাবার পর সে একটা বাস খেয়েছে। এখানেই শেষ না, এক পর্যায়ে নিষাদের স্কুলও খেয়ে ফেলেছে।

নিষাদের পেট থেকে কথা বের করার জন্যে আমি তাকে পাঠালাম আমাদের নিচতলার ফ্ল্যাটে। অবসর প্রকাশনার আলমগীর রহমানের স্ত্রীর কাছে। যাকে নিষাদ চাচী ডাকে। নিষাদের সঙ্গে তাঁর অতি ভালো সম্পর্ক। আমার ধারণা হল তিনি হয়ত কায়দা করে কিছু বের করতে পারবেন। তাদের কথাবার্তার নমুনা দিচ্ছি—

নিষাদের চাচী	:	আচ্ছা নিষাদ। ঐ দিন স্কুল থেকে যে লোকটার সঙ্গে তুমি গিয়েছিলে সে তোমাকে কি বলেছে ?
নিষাদ	:	বলেছে খোকা আইসক্রিম খাবে ? আমাকে খোকা ডেকেছে তখন আমি বলেছি— আমার নাম খোকা না। আমার নাম নিষাদ।
চাচী	:	তুমি আইসক্রিম খেলে ?
নিষাদ	:	হ্যাঁ। লাল রঙের 'ললি' আইসক্রিম।
চাচী	:	'তারপর।'
নিষাদ	:	তারপর লোকটা ভূত হয়ে আইসক্রিমওয়ালাকে কপ করে খেয়ে ফেলল।
চাচী	:	বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে না নিষাদ। বানিয়ে কথা বললে চাচী রাগ করবে।
নিষাদ	:	রাগ করা ভালো না চাচী।
নিষাদ	:	আমি জানি রাগ করা ভালো না। কিন্তু ঐ দিন কি হয়েছিল না বললে আমি খুব রাগ করব। যে আইসক্রিম খাওয়ালো সে দেখতে কেমন বল।
নিষাদ	:	সে দেখতে দৈত্যের মতন। মাথায় শিং আছে। দৈত্যটা এত বড় একটা ডিম পাড়ল।
চাচী	:	(হতাশ গলায়) ডিম পাড়লো ?
নিষাদ	:	হ্যাঁ। লাল রঙের ডিম। দৈত্যটার নাম হাট্টিমা টিম টিম। হাট্টিমা টিম টিমরা মাঠে ডিম পাড়ে।

==========

নিষাদের চাচী পুরোপুরি হতাশ হয়ে আলোচনা বন্ধ করলেন। আমি মোহিত কামাল নামে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গেও কথা বললাম। তিনি একজন লেখক। অনেক বইপত্র লিখেছেন। তিনি বললেন, আপনার ছেলে হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টা মনে করতে চাইছে না বলেই উদ্ভট সব গল্প বানাচ্ছে। সাইকোলজির ভাষায় একে বলে প্রতিরোধ পদ্ধতি, Defence mechanism. মস্তিষ্ক নিজেকে কষ্টকর স্মৃতি মনে করা থেকে বিরত করছে। কবিতার ভাষায়—

কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে
ভালোবাসে।

নিষাদ মনে করতে চাইছে না কাজেই তাকে এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না করাই ভালো।

আমি যে ভোক্কসের সঙ্গে কথা বলব তাও সম্ভব হচ্ছে না। পুলিশ তাকে রিমান্ডে নিয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করছে। রিমান্ড শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ নেই। রিমান্ড শেষ হবে শনিবার বিকেলে। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

রিমান্ড কি তোমরা জান? রিমান্ড হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে অপরাধীর পেট থেকে কথা বের করা। মানবাধিকার আইনে শারীরিক শাস্তি দিয়ে অপরাধীর কাছ থেকে কথা আদায় নিষিদ্ধ। কিন্তু পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে শারীরিক এবং মানসিক দু'ধরনের শাস্তি দেয় বলে শুনেছি।

এখন অপরাধীকে শুরুতেই ক্রসফায়ারের ভয় দেখানো হয়। বলা হয়— যা জান বল। নয়ত তোমাকে ক্রসফায়ারে দেয়া হবে।

ক্রসফায়ার হচ্ছে বিচার ছাড়াই গুলি করে মেরে ফেলা এবং পরে ঘোষণা দেয়া যে অপরাধীর সঙ্গে গোলাগুলি হয়েছে। এতেই অপরাধীর মৃত্যু। দুঃখজনক হলেও সত্যি এমন ঘটনা বাংলাদেশে প্রচুর ঘটছে। আমরা নিজেদের সভ্য জাতি বলছি কিন্তু কাজ করছি অসভ্যের মতো।

ওসি সাহেব রবিবার বিকাল তিনটায় আমাকে যেতে বললেন। আমি উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, ভোক্কস নামের ঐ বস্তু কঠিন জিনিস। কিছুতেই মুখ খুলেনি। ইন্টারোগেশন তার কাছে কোনো ব্যাপারই না।

'কিছুই বলেনি ?'

'একটা শব্দও না। প্রশ্ন করলে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ফোঁৎ করে শব্দ করে। দেখুন চেষ্টা করে আপনি কথা বলাতে পারেন কি-না।'

'সে আছে কোথায় ?'

'হাজতে আছে। আপনার কথা বলেছি। সে আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয়েছে। তবে শর্ত দিয়েছে।'

'কি শর্ত ?'

'সে শুধু আপনার সঙ্গেই কথা বলবে। কথা বলার সময় দ্বিতীয় কেউ থাকতে পারবে না।'

'আমরা কোথায় কথা বলব ?'

'আপনাকে হাজতে ঢুকিয়ে দেব। কথা বলবেন হাজতের ভেতর। তাকে হাজতের বাইরে আনা ঠিক হবে না। বিপ্জ আছে।'

ভোক্কসকে হাতকড়া পরা অবস্থায় মেঝেতে বসে থাকতে দেখলাম। শুধু যে হাতকড়া তা-না, তার পায়ে ডান্ডাবেড়ি লাগানো। ডান্ডাবেড়ি ভয়ংকর এক জিনিস, দু'টা পা লোহার একটা ডান্ডায় আটকানো। ডান্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় সে হাঁটতে পারবে কিন্তু দৌড়াতে পারবে না।

ভোক্কস আমাকে দেখে হাসল। আমি বললাম, আপনি যে নিষাদকে স্কুল থেকে নিয়ে যাননি এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। চায়ের এক দোকানি আপনাকে ভোর থেকে লেকের পাড়ের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখেছে। আপনার এই মামলা যখন কোর্টে উঠবে তখন আমি আপনার পক্ষে সাক্ষী দেব। চায়ের দোকানদারও দেবে। আপনি এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন। এখন বলুন নিষাদকে আপনি কোথায় পেয়েছেন ?

ভোক্কস বলল, কোথায় পেয়েছি বলছি। বলার আগে ভূমিকা দিতে হবে। ভূমিকা ছাড়া বুঝবেন না।

আমি বললাম, ভূমিকা দিন।

ভোক্কস বলল, আপনি পত্রিকায় প্রায়ই নিশ্চয়ই পড়েন পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একে উদ্ধার করে ওকে উদ্ধার করে। সন্ত্রাসী ধরে। একে-৪৭ রাইফেলসহ মহিলা ধরে। জঙ্গিও ধরে। পড়েন না ?

'পড়ি।'

'আপনার কখনো জানতে ইচ্ছা করে না গোপন সংবাদগুলি পুলিশ বা র‍্যাবকে কে দেয় ?'

'বিষয়টা সেভাবে চিন্তা করি নি।'

'গোপন সংবাদ দেই আমরা অর্থাৎ ভোক্কসরা। যখন আমরা নিজেরা কিছু করতে পারি না তখন পলিশকে খবর দেই।'

আমি তাকিয়ে আছি। কি বলব বুঝতে পারছি না। ভোক্কস বলল, আমি ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেল খেটেছি। বেকেলে কি ছিল জানেন?

'না।'

'বোমা ছিল। এই জন্যেই বেকেলে নিয়ে দৌড় দিয়েছি। মামলায় আলামত হিসেবে পুলিশ কিন্তু বেকেলে কি ছিল তা বলেনি। বললে মামলার রায় অন্য রকম হতো।'

'পুলিশ বলেনি কেন?'

'জানি না। হয়ত তারা জড়িত ছিল। কিংবা বোমাবাজরা পুলিশকে টাকা-পয়সা দিয়ে হাত করেছে।'

'আপনি বলেননি কেন?'

'আমি বললে আমার ভোক্কস পরিচয় প্রকাশ হবার সম্ভাবনা ছিল। আমাদের পরিচয় দেয়া নিষেধ।'

'এখন বলুন আমার ছেলেকে কোথায় পেয়েছেন?'

'আপনার ছেলেকে আমি পাইনি। অন্য এক ভোক্কস পেয়েছে। নিষাদ অতি দুষ্ট এক মহিলার হাতে পড়েছিল। ভোক্কস তাকে উদ্ধার করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আমি নিয়ে এসেছি।'

'দুষ্ট মহিলাটা কে? কোথায় থাকে। তার উদ্দেশ্য কি?

'সে এক জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। বান্দরবানের মাইক্যাংছড়ির জঙ্গলে তাদের আস্তানা। এর বেশি আমি কিছু জানি না। আপনি এখন যান। আমি এর বেশি কিছু বলব না।'

এখন তোমাদের কী মনে হয়? ভোক্কস বলে সত্যি কিছু আছে? তোমরা যেমন বুঝতে পারছ না, আমিও কিন্তু পারছি না। মহান ইংরেজ লেখক শেক্সপিয়ার এইজন্যেই হয়ত লিখেছেন 'স্বর্গ এবং মর্তে এমন সব বিষয় আছে যা মানুষের কল্পনারও বাইরে।'

হতেও তো পারে। তাই না? তোমরা ভালো থেকো। চেষ্টা করো যেন নিষাদের মতো বিপদে না পড়তে হয়।

প্রশ্নমালা

১. 'পশ্চিম রণাঙ্গন শান্ত' কবে লেখা ?

২. মস্তিষ্কের Defence Mechanism কি ?

৩. পুলিশের রিমান্ড বিষয়টা কি ?

৪. 'ক্রসফায়ার' কি ?

৫. 'ডাণ্ডাবেড়ি'র ব্যবহার কি ?

৬. একজন মহান ইংরেজ লেখকের নাম বল।

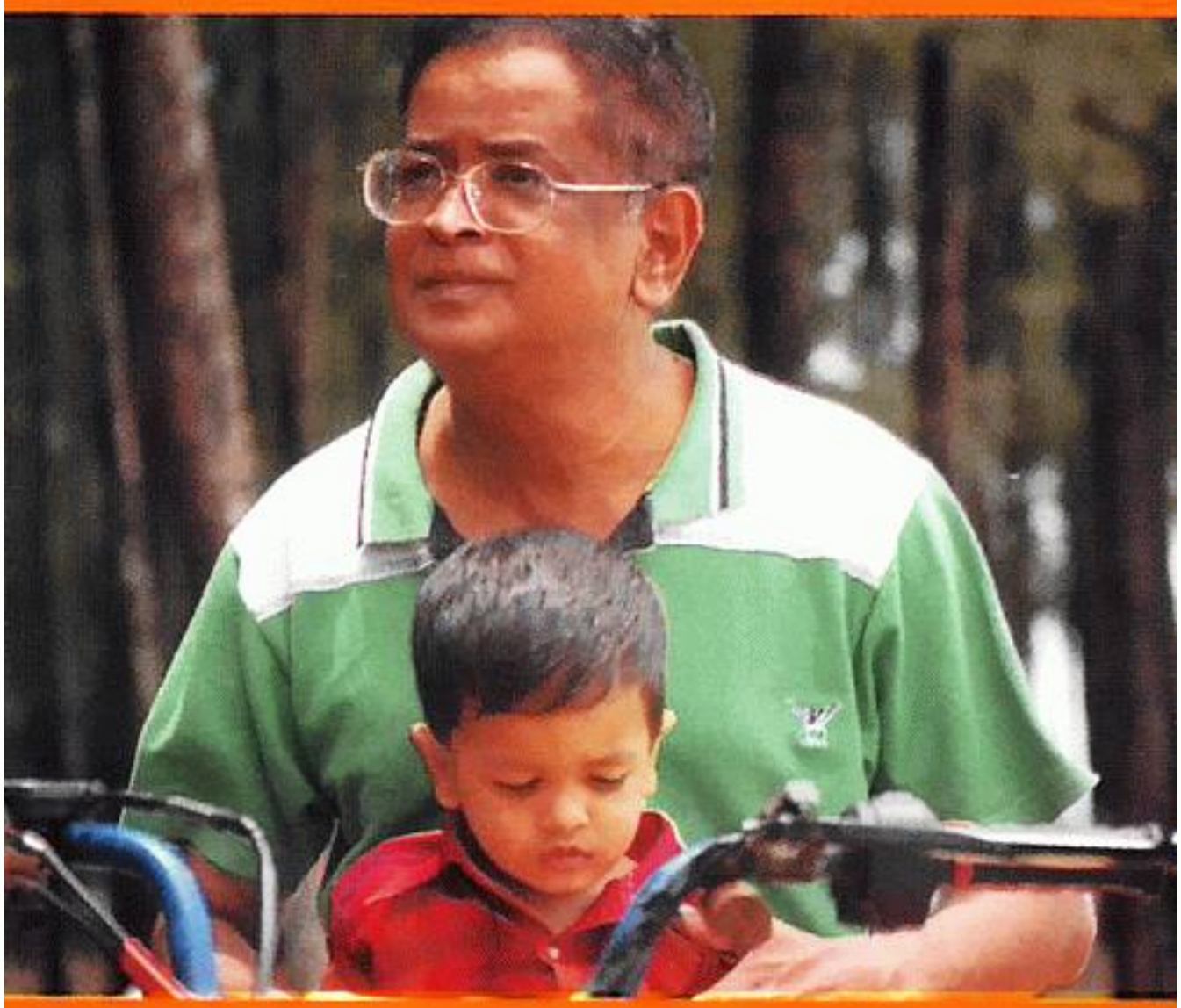

আমি হুমায়ূন আহমেদ, ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ সনে নানাবাড়ি মোহনগঞ্জে (নেত্রকোনা জেলা) জন্মগ্রহণ করেছি। পাসপোর্ট এবং সার্টিফিকেটে লেখা ১০ এপ্রিল ১৯৫০, কেন এই ভুল হয়েছে জানি না।

মা আয়েশা আক্তার। বাবা-মা দু'জনই লেখালেখি করতেন। কিছুদিন আগে মা'র আত্মজৈবনিক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মোটামুটি হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন।

আমার সংসার শাওন এবং পুত্র নিষাদকে নিয়ে। গায়িকা শাওন প্রতি রাতে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে পুত্রকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করে। পুত্র ঘুমায় না, আমিই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যেই মনে হয়, জীবনটা খারাপ না তো!